অধ্যায় ১১

জীবপ্রযুক্তি
BIOTECHNOLOGY

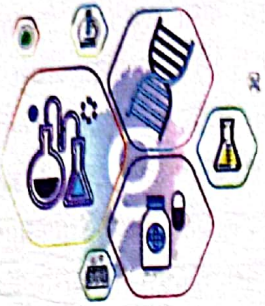

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বিভিন্ন কলাকৌশলকে কাজে লাগিয়ে জীব থেকে মানুষের প্রয়োজনীয় ও অর্থকরী উপাদান তৈরি করে আসছে। যেমন-দুধ থেকে দই, মাখন ও পনির, ফল থেকে মদ, ময়দা থেকে পাউরুটি তৈরি ইত্যাদি। এসব প্রযুক্তি প্রকৃতপক্ষে জীবপ্রযুক্তি। অপরাপর বিজ্ঞান শাখার মতো জীবপ্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি মানুষকে স্বপ্নময় ভবিষ্যতের হাতছানি দেয়। বর্তমান যুগে জিন প্রযুক্তিই আধুনিক জীবপ্রযুক্তির প্রধান স্থান দখল করে নিয়েছে। এ অধ্যায়ে জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দাবলি
(Key words)

- টিস্যু কালচার
- জিন প্রকৌশল
- জিন ক্লোনিং
- প্লাজমিড
- ট্রান্সজেনিক প্রাণী
- জিনোম সিকুয়েন্সিং

পিরিয়ড সংখ্যা ১০: এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ২। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৩। জিন ক্লোনিং ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫। জিনোম সিকোয়েন্সিং এর প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬। জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭। জীবপ্রযুক্তির বিকাশের সাথে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● টিস্যু কালচার প্রযুক্তি প্রক্রিয়া ও ব্যবহার ● জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রক্রিয়া ● জিন ক্লোনিং ● জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার (রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির প্রয়োগ), কৃষি উৎপাদন, চিকিৎসা ও ওষুধ শিল্পে (ইনসুলিন ও ইন্টারফেরন), পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ● জিনোম সিকোয়েন্সিং এর প্রয়োগ ● জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগে জীবনিরাপত্তা বিধানসমূহ

সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণীর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করে মানব কল্যাণকর প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করার পদ্ধতিকে বায়োটেকনোলজি বা জৈবপ্রযুক্তি বা জীবপ্রযুক্তি বলে। বিজ্ঞানী কোলম্যান (1968)-এর মতে "বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত নীতি অনুসরণ ও প্রয়োগ করে অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী ব্যবহার করার মাধ্যমে মানুষের জন্য কল্যাণকর ও ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী তৈরির বিশেষ প্রযুক্তিকে বায়োটেকনোলজি বা জীবপ্রযুক্তি বলে"। হাঙ্গেরিয় কৃষি প্রকৌশলি কার্ল এরিখ (Karl Erekh) 1919 সালে সর্বপ্রথম Biotechnology শব্দটি ব্যবহার করেন। এর আভিধানিক অর্থ হলো জীবনের প্রযুক্তি। Biology এবং Technology এর সমন্বয়ে Biotechnology শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে আধুনিক বায়োটেকনোলজির সূচনা হলেও সাম্প্রতিককালে এটি ব্যাপক উৎকর্ষ লাভ করেছে। জীবপ্রযুক্তির পরিধি ব্যাখ্যা করার জন্য নিম্নলিখিত শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়-

CamScanner

১১.১ উদ্ভিদ টিস্যু কালচার (Plant Tissue Culture)

টিস্যু কালচার এমন এক বিশেষ ধরনের কৌশল যেখানে উদ্ভিদের সজীব কোনো ক্ষুদ্র অংশ বা অংশের টিস্যুকে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত পুষ্টি মাধ্যমে (nutrient medium) জীবাণুমুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আবাদ (culture) করে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে গবেষণা তথা অণুচারা (plantlets) উৎপাদনের ক্ষমতা যাচাই করা হয়। এ প্রযুক্তিতে উদ্ভিদের যে কোনো সজীব অংশ যেমন- কোষ, মেরিস্টেম, পরাগরেণু, ডিম্বক, ভ্রূণ, নিউসেলাস এমন কি প্রোটোপ্লাস্টেরও কালচার করা সম্ভব যা থেকে ধারাবাহিকভাবে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদের বিকাশ ঘটতে পারে। জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী গোটলিয়েব হ্যাবারল্যান্ডট (Gottlieb Haberlandt), 1902 সালে মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, উদ্ভিদের বিভাজনক্ষম যে কোনো সজীব অংশ থেকে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ সৃষ্টি হতে পারে। উদ্ভিদের এ ক্ষমতাকে টোটিপোটেনশিয়ালিটি (totipotentiality) বলে। হ্যাবারল্যান্ডট 1920 সালে সর্বপ্রথম টিস্যু কালচার পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এজন্য তাঁকে টিস্যু কালচারের জনক (father of tissue culture) বলা হয়। গাউথারেট ও নবিকোর্ট (Gautheret and Nobecourt) 1939 সালে সর্বপ্রথম সফলভাবে উদ্ভিদ টিস্যুকে আবাদ মাধ্যমে জন্মাতে সক্ষম হন। টিস্যু কালচার সম্পূর্ণরূপে কাচপাত্রের মধ্যে সম্পন্ন করা হয় বলে একে ইন ভিট্রো কালচার (In-vitro culture) বলা হয়।

টিস্যু কালচারে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ

যন্ত্রপাতি		কাচের উপকরণ	রাসায়নিক দ্রব্য	সহযোগি উপকরণ
■ সেল কালচার হুড	■ অটোক্লাভ	■ কনিক্যাল ফ্লাস্ক	■ জেলিং এজেন্ট	■ কাঁচি
■ এয়ার ফ্লো কেবিনেট	■ ব্যালেন্স	■ টেস্ট টিউব	■ প্লান্ট গ্রোথ রেগুলেটর	■ চিমটা
■ সেন্ট্রিফিউজ মেসিন	■ ভরটেক্স	■ পেট্রিডিশ	■ কালচার মিডিয়া (অ্যাগার)	■ সার্জিকেল ব্লেড
■ রেফ্রিজারেটর	■ স্যাকার	■ রোলার বোতল	■ অজৈব লবণ ও ভিটামিন	■ স্পেটুলা
■ ফ্রিজার (–20°C)	■ ব্লেন্ডার	■ পিপেট	■ অ্যান্টিবায়োটিকস	■ ফিল্টার পেপার
■ সেল কাউন্টার	■ pH মিটার	■ বিকার	■ সুগার ও ঈস্ট	■ বালতি
■ মাইক্রোস্কোপ	■ ইনকিউবেটর	■ মেজারিং জার	■ অক্সিন ও সাইটোকাইনিন	■ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল
■ হট এয়ার ওভেন	■ ওয়াটার বাথ	■ রিএজেন্ট বোতল	■ অ্যামিনো অ্যাসিড	

টিস্যু কালচারের মূল পর্যায়

টিস্যু কালচার প্রযুক্তিকে বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। সেজন্য টিস্যু কালচারের প্রয়োগ পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ধরনের হয়। অধিকাংশক্ষেত্রে টিস্যু কালচারে নিম্নলিখিত মূল পর্যায় প্রয়োগ করা হয়-

১। **প্রাথমিক কালচার সৃষ্টি:** এ পর্যায়ে নির্বীজিত (sterilized) উদ্ভিদাংশ কৃত্রিম পুষ্টি মাধ্যমে স্থাপন এবং জীবাণুমুক্ত অবস্থায় জৈবনিক প্রক্রিয়া পুনজাগরণ (regeneration) শুরু করানো হয়।

২। **সেকেন্ডারি বৃদ্ধি:** এ পর্যায়ে কালচারকৃত উদ্ভিদাংশের নানা ধরনের দৈহিক ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদ অনুচারা সৃষ্টি করা হয়।

৩। **পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদের পুনঃজন্ম:** এ পর্যায়ে পুনঃজন্ম নেয়া অণুচারাতে মূল সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ অণুউদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়।

৪। **প্রাকৃতিক পরিবেশে অণুউদ্ভিদ স্থানান্তর:** এ পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ অণুউদ্ভিদগুলোকে কালচার পাত্র থেকে বের করে প্রাকৃতিক পরিবেশে খাপ খাওয়ানো এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে ফিরিয়ে আনা হয়।

টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ধাপসমূহ

১। **টিস্যু নির্বাচন:** টিস্যু কালচারের জন্য সুস্থ, নিরোগ ও উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উদ্ভিদ থেকে টিস্যু সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত টিস্যুকে এক্সপ্লান্ট (explant) বলে। সাধারণত কাণ্ডের শীর্ষমুকুল ও পার্শ্বমুকুল এক্সপ্লান্ট হিসেবে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

CamScanner

২। কালচার মিডিয়াম বা আবাদ মাধ্যম তৈরি: উদ্ভিদ টিস্যুকে কালচার করার জন্য প্রাথমিকভাবে একটি আবাদ মাধ্যম বা কালচার মিডিয়াম (culture medium) তৈরি করা হয়। অ্যাগার অ্যাগার, খনিজলবণ, ভিটামিন, চিনি, ফাইটোহরমোন ইত্যাদির মাধ্যমে কালচার মিডিয়াম তৈরি করা হয়। এতে উদ্ভিদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থাকে। কালচার মিডিয়ামকে ঘন করতে সঠিক পরিমাণে অ্যাগার মিশাতে হয়। উদ্ভিদ বৃদ্ধির সকল মৌলিক উপাদান সমৃদ্ধ অর্ধ তরল কালচার মিডিয়ামকে বেসাল মিডিয়াম (basal medium) বা গ্রোথ মিডিয়াম (growth medium) বলে।

চিত্র: ১১.১ টিস্যু কালচার প্রযুক্তির বিভিন্ন ধাপ

৩। জীবাণুমুক্তকরণ: কালচার মিডিয়ামের পরিমাণ মতো অংশ কনিক্যাল ফ্লাস্ক বা টেস্টটিউবে নিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়। উদ্ভিদের যে অংশকে কালচার করা হবে সেটিও জীবাণুমুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে টিস্যু কালচারে ব্যবহৃত সকল উপকরণই জীবাণুমুক্ত করতে হয়। অটোক্ল্যাভ যন্ত্র (autoclave), হট এয়ার ওভেন, অ্যালকোহল ইত্যাদি ব্যবহার করে এদের জীবাণুমুক্ত করা হয়।

৪। মিডিয়ামে টিস্যু স্থাপন: জীবাণুমুক্ত উদ্ভিদ টিস্যুকে কনিক্যাল ফ্লাস্ক বা টেস্টটিউবের জীবাণুমুক্ত কালচার মিডিয়ামে স্থাপন করে পাত্রের মুখ বন্ধ করে নির্দিষ্ট আলো (3000-5000 লাক্স) ও তাপমাত্রায় (17-20° সেলসিয়াস) রাখা হয়। কালচার মিডিয়ামের pH= 5.5-5.8 রাখা হয়।

৫। ক্যালাস ও অণুচারা সৃষ্টি: নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কালচার করা টিস্যুতে নানা ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়। টিস্যু বারবার বিভাজিত হয়ে আকারবিহীন গঠন সৃষ্টি করে। একে ক্যালাস (callus) বলে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ক্যালাস থেকে মূলবিহীন অণুচারা (plantlets) উৎপন্ন হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কালচার মাধ্যমে স্থাপিত টিস্যু থেকে সরাসরি অণুচারা উৎপন্ন হয়।

৬। অণুউদ্ভিদ সৃষ্টি: কালচার মাধ্যমে উৎপাদিত অণুচারাগুলোকে সার্জিকেল ব্লেড দিয়ে সূক্ষ্মভাবে কেটে মূল উৎপাদনের জন্য অন্য একটি কালচার মিডিয়ামে স্থানান্তর করা হয়। এখানে মূলযুক্ত অণুউদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।

৭। অণুউদ্ভিদ টবে ও মাঠে স্থানান্তর: উপযুক্ত সংখ্যক সুগঠিত মূল, কাণ্ড ও পাতাযুক্ত অণুউদ্ভিদকে কালচার পাত্র হতে সরিয়ে সাবধানতার সাথে টবের মাটিতে স্থানান্তর করা হয়। টবে চারাগুলোকে প্রাকৃতিক পরিবেশে রেখে সহনীয় করে তোলা হয় এবং এক পর্যায়ে সজীব ও সবল চারা মাঠের জমিতে রোপন করা হয়।

CamScanner

টিস্যু কালচার প্রযুক্তির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of Tissue culture)

টিস্যু কালচার প্রযুক্তি আধুনিক কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখছে। কৃষিপণ্যের সহজ উৎপাদনের জন্য এ প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা যেমন সুবিধা পাচ্ছি তেমনি এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হলো:

টিস্যু কালচার প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ

১। মাতৃউদ্ভিদের প্রজাতিগত চারিত্রিক গুণাবলি অক্ষুন্ন রেখে চারা উৎপাদন।
২। উদ্ভিদের যে কোনো টিস্যু থেকে চারা উৎপাদন।
৩। ভাইরাসমুক্ত চারা উৎপাদন।
৪। অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক চারা উৎপাদন।
৫। কলমে অক্ষম উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।
৬। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে না এমন উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।
৭। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতির বিপুল পরিমাণ চারা উৎপাদনের মাধ্যমে উক্ত প্রজাতিকে সংরক্ষণ।
৮। বছরের যে কোনো ঋতুতে যে কোনো উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।
৯। বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ঝামেলামুক্ত হওয়া।
১০। অল্প পরিসরে অধিক চারা উৎপাদন।
১১। সস্তায় বাণিজ্যিক চারা উৎপাদন।
১২। বিদেশি জাতের উদ্ভিদ থেকে দেশি আবহাওয়া উপযোগি জাত সৃষ্টি করা প্রভৃতি।

টিস্যু কালচার প্রযুক্তির অসুবিধাসমূহ

১। ব্যয়বহুল গবেষণাগার স্থাপন।
২। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা।
৩। বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব।
৪। গবেষণাগারে সঠিক পরিবেশমান নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতায় উৎপাদিত চারা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া।
৫। উৎপাদিত চারা সঠিক সময়ে বিক্রি না হওয়া।
৬। দেরিতে ফল আসা উদ্ভিদের প্রজননগত সমস্যার কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখিন হওয়া।
৭। উদ্ভিদের অঙ্গজ প্রজননের ফলে কোনো নতুন প্রকরণ সৃষ্টি না হওয়া।

উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নতজাত উদ্ভাবনে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ভূমিকা/ টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ব্যবহার

বায়োটেকনোলজির একটি নতুন শাখা হিসেবে বিশ্বব্যাপি টিস্যু কালচারের ব্যাপক মাত্রায় প্রয়োগ চলছে। উদ্ভিদ প্রজনন, উদ্ভিদ উৎপাদন ও উদ্ভিদের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে টিস্যু কালচার ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। উদ্ভিদবিজ্ঞানে টিস্যু কালচারের গুরুত্ব ও প্রয়োগ অপরিসীম। বিগত দুই দশকে উদ্ভিদ কোষ, টিস্যু এবং অঙ্গ কালচারের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রযুক্তিটি এখন বায়োটেকনোলজিতে এক অন্যতম সহায়ক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য মাইক্রোপ্রোপাগেশন, মেরিস্টেম (কাণ্ডাগ্র) কালচারের মাধ্যমে ভাইরাস মুক্ত নিউক্লিয়ার স্টক উৎপাদন, অ্যান্থার কালচার, প্রোটোপ্লাস্ট কালচার, প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নতজাত উদ্ভাবনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে টিস্যু কালচারের ব্যবহার বা প্রয়োগ সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। **মেরিস্টেম কালচার** (Meristem culture): উদ্ভিদের শীর্ষমুকুলের অগ্রভাগের ভাজক টিস্যুর কালচারকে মেরিস্টেম কালচার বলে। রোগমুক্ত বিশেষ করে ভাইরাস মুক্ত চারা উৎপাদন করতে মেরিস্টেম কালচার করা হয়।

CamScanner

মোরেল ও মারটিন (Morel and Martin) 1952 সালে ভাইরাস মুক্ত ডালিয়া উদ্ভিদের চারা তৈরির জন্য সর্বপ্রথম মেরিস্টেম কালচার প্রয়োগ করেন। বর্তমানে আনারস ও টমেটোর চারা উৎপাদনে এ পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

২। **মাইক্রোপ্রোপাগেশন** (Micropropagation): মাতৃ গুণাবলি অক্ষুন্ন রেখে কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদের দেহকোষ বা টিস্যু বা অন্য কোনো অংশ থেকে আধুনিক টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে অসংখ্য চারা উৎপাদনকে মাইক্রোপ্রোপাগেশন বলা হয়। আমেরিকার উদ্ভিদবিজ্ঞানী এফ সি স্টিওয়ার্ড (F. C. Steward) 1958 সালে মাইক্রোপ্রোপাগেশন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। যেসব উদ্ভিদের বীজ উৎপাদিত হয় না কিংবা সহজে অঙ্গজ জনন ঘটে না সেসব উদ্ভিদের চারা উৎপাদনের জন্য মাইক্রোপ্রাপাগেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশে এ পদ্ধতিতে বেল ও তুঁতের চারা উৎপাদন করা হয়েছে।

৩। **সোমাটিক এমব্রায়োজেনেসিস** (Somatic embryogenesis): যে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উদ্ভিদের একটি সোমাটিক কোষ বা দৈহিক কোষ থেকে ভ্রূণ সৃষ্টি করা হয় এবং সে ভ্রূণ থেকে পরবর্তীতে চারা উৎপাদন করা হয় তাকে সোমাটিক এমব্রায়োজেনেসিস বলে। আমেরিকার উদ্ভিদবিজ্ঞানী এফ সি স্টিওয়ার্ড (F. C. Steward) ও সহযোগিরা 1958 সালে সোমাটিক এমব্রায়োজেনেসিস পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং এ পদ্ধতিতে গাজরের চারা উৎপাদন করেন।

৪। **সোমাটিক হাইব্রিডাইজেশন** (Somatic hybridization): একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন জাত কিংবা দুটি ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের দুটি কোষের প্রোটোপ্লাস্টের মিলনের মাধ্যমে কৃত্রিম পদ্ধতিতে হাইব্রিড উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে সোমাটিক হাইব্রিডাইজেশন বা সোমাটিক ফিউশন বলে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কোষকে সাইব্রিড (cybrid) বলে। সাইব্রিড সৃষ্টিতে অংশগ্রহণকারী দুটি কোষকে হেটারোক্যারিওন (heterokaryons) বলে। সাইব্রিড থেকে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অসংখ্য চারা উৎপাদন করা যায়। কার্লসন (Carlson) 1972 সালে সোমাটিক হাইব্রিডাইজেশন পদ্ধতির সূচনা করেন। অঙ্গজ প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করা যায় না এমন সব উদ্ভিদের হেটারোজাইগাস লাইন সৃষ্টির জন্য সোমাটিক হাইব্রিডাইজেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

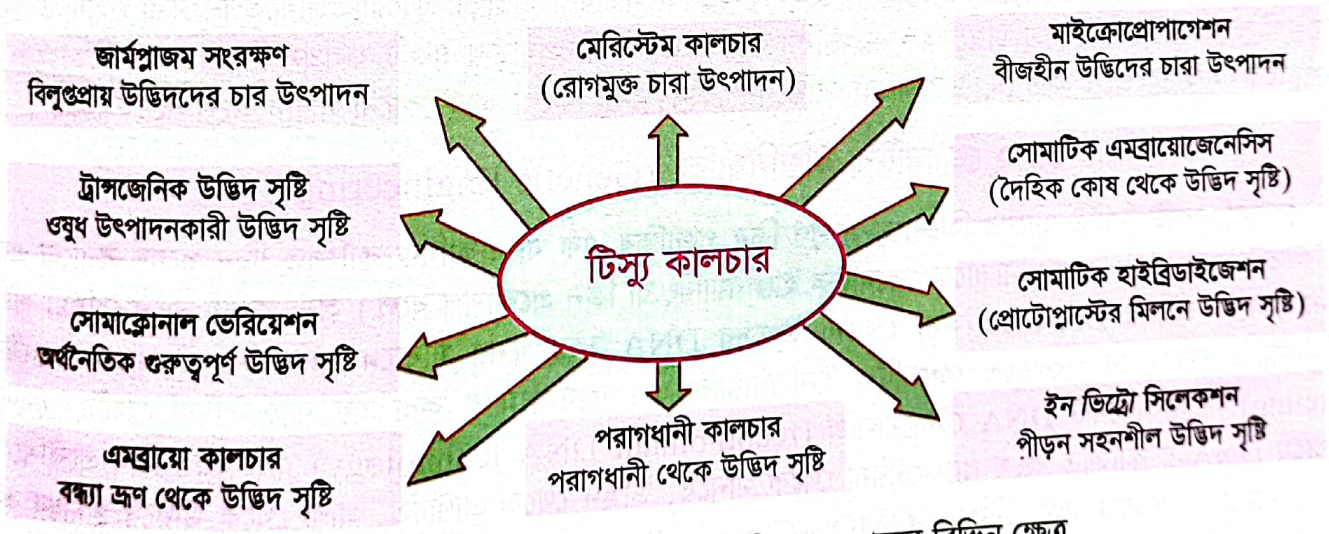

চিত্র: ১১.২ টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্র

৫। ***ইন ভিট্রো* সিলেকশন** (*In vitro* selection): পীড়ন সহনশীল জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টির লক্ষে আবাদ অবস্থার কোনো উদ্ভিদে সুনির্দিষ্ট পীড়ন বা চাপ (stress) প্রয়োগ করে নির্বাচন করাকে *ইন ভিট্রো* সিলেকশন বলে। এ প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট পীড়ন সহনশীল বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন (যেমন- লবণ সহনশীল) উদ্ভিদ বা কোষ নির্বাচন করে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়। *ইন ভিট্রো* সিলেকশন পদ্ধতিতে ভাইরাস প্রতিরোধী গোলআলু, ধান, গম ও কলার জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৬। **পরাগধানী কালচার** (Anther culture): পুষ্পের পরাগধানী থেকে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে পরাগধানী কালচার বা অ্যান্থার কালচার বলে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে অ্যান্ড্রোজেনিক হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদের

চারা উৎপাদন করা হয় এবং জেনেটিক গবেষণার জন্য হোমোজাইগাস ব্রিডিং লাইন সৃষ্টি করা হয়। চীন দেশে এ পদ্ধতিতে গুয়ান -18 জাতের ধান ও জিনঘুয়া-1 জাতের গম উৎপাদন করা হয়েছে।

৭। এমব্রায়ো কালচার (Embryo culture): পরিপক্ক কিংবা অপরিপক্ক বন্ধ্যা প্রকৃতির উদ্ভিদ ভ্রূণ থেকে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চারা উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে এমব্রায়ো কালচার বলে। বীজের সুপ্তাবস্থা দমন করা কিংবা প্রজননশীল উদ্ভিদ উৎপাদনের জন্য এমব্রায়ো কালচার করা হয়। এ পদ্ধতিতে পেঁপে, বেল ও বেগুনের চারা উৎপাদন করা হয়েছে।

৮। সোমাক্লোনাল ভেরিয়েশন (Somaclonal variation): টিস্যু কালচার প্রযুক্তিতে উৎপাদিত উদ্ভিদের মধ্যে যে প্রকরণ (পার্থক্য) পরিলক্ষিত হয় তাকে সোমাক্লোনাল ভেরিয়েশন বলে। কোষ কালচার প্রযুক্তিতে উৎপাদিত উদ্ভিদের মধ্যে বিরাজিত প্রকরণকেও সোমাক্লোনাল ভেরিয়েশন বলে। এ প্রযুক্তির প্রধান পাঁচটি প্রয়োগক্ষেত্র হলো: (১) অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের চারা উৎপাদন; (২) রোগ প্রতিরোধী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন; (৩) অজীব পীড়ন সহনশীল উদ্ভিদের চারা উৎপাদন; (৪) আগাছা নাশক প্রতিরোধী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন; এবং (৫) উদ্ভিদ বীজের গুণগত মান উন্নয়ন।

৯। ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি: (Production of transgenic plants): জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে যে জিনকে কোনো একটি জীবের দেহে স্থানান্তর করা হয় তাকে ট্রান্সজিন (transgene) বলে। যে জীবে ট্রান্সজিন স্থানান্তর ও বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটানো হয় তাকে ট্রান্সজেনিক জীব (transgenic organism) বলে। উদ্ভিদ কোষে ট্রান্সজিন স্থানান্তর করে সেখান থেকে টিস্যু কালচার প্রযুক্তিতে চারা উৎপাদন করা হয়। টিস্যু কালচার প্রযুক্তিতে উৎপাদিত ট্রান্সজেনিক কলা, টমেটো, ধান, গাজর ইত্যাদি উদ্ভিদ থেকে হেপাটাইটিস বি, কলেরা, HIV ইত্যাদি রোগের টিকা উৎপাদনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

১০। জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ (Germplasm Conservation): বিপন্ন, বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদদের এক্স-সিটু পদ্ধতিতে জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে টিস্যু কালচার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। গ্রিন হাইজ, নার্সারি কিংবা মাঠে সংরক্ষণের চেয়ে ইন ভিট্রো জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ অনেক সাশ্রয়ী। এছাড়া ক্রায়োপ্রিজারভেশন করা কোষ ও কলা থেকে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উদ্ভিদের পুনরুজ্জীবন করা সংরক্ষণ জীবপ্রযুক্তির একটি ফলপ্রসু দিক। ক্রায়োপ্রিজারভেশন হলো তরল নাইট্রোজেনে অতি নিম্ন তাপমাত্রায় উদ্ভিদের কোষ, কলা কিংবা অন্য কোনো সজীব অংশ সংরক্ষণ করা।

১১.২ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering)

কোনো একটি নির্দিষ্ট জীবের জিনোমে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতির এক বা একাধিক কাঙ্খিত জিন প্রবেশ করানো এবং কাঙ্খিত জিনের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল বলে। অন্য কথায় নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের DNA তে অন্য কোনো উৎসের DNA সংস্থাপনের মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। যে পদ্ধতিতে জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং-এর কার্য সমাধা করা হয় তাকে জিন ক্লোনিং (Gene cloning) বা রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (recombinant DNA technology) বলা হয়। জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে DNA-র কাঙ্খিত অংশ ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে সৃষ্ট জীবকে GMO (Genetically modified organism), GEO (Genetically engineered organism) বা TO (Transgenic organism) বলে। জেমস ওয়াটসন (James Watson) ও ফ্রান্সিস ক্রিক (Francis Crick) কর্তৃক 1953 সালে DNA আবিষ্কারের দুই বছর পূর্বে অর্থাৎ 1951 সালে সায়েন্স ফিকশন লেখক জ্যাক উইলিয়ামসন (Jack Williamson) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক ***Dragon's Island***-এ সর্বপ্রথম "genetic engineering" শব্দটি ব্যবহার করেন।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাইলফলক (Milestones of genetic engineering)

- 1972 সালে পল বার্গ (Paul Berg) সর্বপ্রথম রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করেন। এক্ষেত্রে ল্যাম্বডা ভাইরাসের DNA-র সাথে বানরের দেহে বিদ্যমান SV40 ভাইরাসের DNA-র সংযোগ ঘটানো হয়। এজন্য তাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জনক বলা হয়।

CamScanner

- 1972 সালে হার্বার্ট বয়্যার (Herbert Boyer) ও স্ট্যানলি কোহেন (Stanley Cohen) সর্বপ্রথম *Escherichia coli* (*E. coli*) ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন প্রবেশ করিয়ে ট্রান্সজেনিক জীব সৃষ্টি করেন।
- 1974 সালে রোডল্ফ জ্যানিচ (Rudolf Jaenisch) ইঁদুরের ভ্রূণে বাইরের DNA প্রবেশ করিয়ে ট্রান্সজেনিক ইঁদুর সৃষ্টি করেন যা বিশ্বের প্রথম ট্রান্সজেনিক প্রাণী হিসেবে বিবেচিত।
- 1982 সাল থেকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া বাজারজাত করা শুরু হয়।
- 1994 সাল থেকে GMO খাদ্য বিক্রি শুরু হয়।
- 2003 সালে প্রথম GMO নকশাকৃত প্রাণী Glofish আমেরিকাতে বিক্রি হয়।
- 2010 সালে J. Craig Venter Institute -এর বিজ্ঞানীরা সিনথিয়া (Synthia) নামক ব্যাকটেরিয়া তৈরি করেন যা বিশ্বের প্রথম সিনথেটিক জীব হিসেবে গণ্য।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যবহৃত উপাদান

১। কাঙ্ক্ষিত জিন (Desired gene): উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব বা উৎপাদ সৃষ্টির লক্ষে কোনো জীবের যে জিনকে জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হয় তাকে কাঙ্খিত জিন বলে।

২। পরিপূরক DNA (Complementary DNA): জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিতে ব্যবহারের জন্য mRNA থেকে সৃষ্ট DNA কে পরিপূরক DNA বা cDNA বলে। রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ এনজাইম দ্বারা ট্রান্সক্রিপশন পদ্ধতিতে এ DNA তৈরি করা হয়। কিছু ভাইরাস (HIV) প্রাকৃতিকভাবে এ ধরনের DNA উৎপাদন করে।

৩। এনজাইম (Enzymes): রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন এনজাইম ও তাদের কার্যাবলি নিম্নে দেয়া হলো:

এনজাইমের নাম	কার্যাবলি
রেস্ট্রিকশন এনজাইম	এ এনজাইম দ্বারা DNA-এর কাঙ্খিত অংশ কর্তন করা হয়। এটি DNA অণুর নির্দিষ্ট ক্ষারক অণুক্রমে কাজ করে।
রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ এনজাইম	mRNA-এর পরিপূরক cDNA অণুক্রম সৃষ্টি করে।
DNA পলিমারেজ এনজাইম	অনুরূপ DNA তৈরি করে (যেমন DNA থেকে cDNA)।
নিউক্লিয়েজ এনজাইম	DNA-র অসমান প্রান্তকে কেটে সমান করে।
টার্মিনাল ট্রান্সফারেজ এনজাইম	DNA-র স্টিকি প্রান্ত তৈরি করে।
DNA লাইগেজ এনজাইম	এটি DNA-র কর্তিত অংশকে প্লাজমিড এর কর্তিত অংশের সাথে জোড়া লাগিয়ে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করে।

রেস্ট্রিকশন এনজাইম (Restriction enzyme)

যেসব এনজাইম দ্বিতন্ত্রী DNA-এর নির্দিষ্ট অনুক্রম বা সিকুয়েন্স শনাক্ত করে দ্বি-সূত্রক বন্ধনী কর্তন করতে পারে তাদের রেস্ট্রিকশন এনজাইম বা রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ বা সংক্ষেপে RE বলে। যেমন, DNA অণুর যেসব স্থানে ক্ষারকের বিন্যাস GAATTC / CTTAAG প্রকৃতির সেখানে কেবল চার ক্ষারক যুক্ত স্থানগুলো *Eco RI* রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা কর্তিত হয়। এ এনজাইমটি অন্য কোনোভাবে সাজানো ক্ষারক সমষ্টিকে স্পর্শ করতে পারে না। বিজ্ঞানী হেমিলটন স্মিথ (Hamilton Smith, 1970) এবং সহযোগিরা রেস্ট্রিকশন এনজাইম আবিষ্কার করেন। ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার জন্য ব্যাকটেরিয়াতে প্রাকৃতিকভাবে রেস্ট্রিকশন এনজাইম তৈরি হয়। কিন্তু DNA অণুর সুনির্দিষ্ট স্থান কাটার জন্য এটি জিন প্রকৌশলে ব্যাপক (কয়েক হাজার রকমের) ব্যবহৃত হয়। এজন্য এদেরকে আণবিক কাঁচি (molecular

scissors) বা জৈবিক ছুরি (biological knife) বলে। রিকম্বিনেন্ট DNA, তৈরিতে ব্যাপক ব্যবহৃত রেস্ট্রিকশন এনজাইমের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো-

এনজাইমের নাম	উৎস	প্রান্তের প্রকৃতি
Eco RI	*Escherichia coli*	sticky
Eco RII	*Escherichia coli*	sticky
Bam HI	*Bacillus amyloliquefaciens*	sticky
Hind II	*Haemophilus influenzae*	sticky
Hpa I	*Haemophilus parainfluenzae*	blant

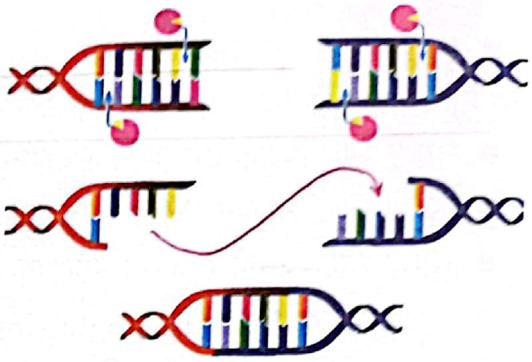

চিত্র ১১.৩ রেস্ট্রিকশন এনজাইমের ব্যবহার

৪। **প্লাজমিড** (Plasmid): জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রধান জীবজ উপাদান হলো প্লাজমিড। ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও যে বৃত্তাকার বা রিং আকৃতির দ্বিসূত্রক **DNA** থাকে তাকে প্লাজমিড বলে। বংশগতি বৈশিষ্ট্য নির্ধারক বহিঃক্রোমোসোমীয় যে কোনো বস্তুর জন্য জে লিডারবার্গ (J. Lederberg) 1952 সালে সর্বপ্রথম প্লাজমিড শব্দটি ব্যবহার করেন। কিন্তু বর্তমানে কেবল ব্যাকটেরিয়ার বহিঃক্রোমোসোমীয় DNA-কেই প্লাজমিড হিসেবে গণ্য করা হয়। প্লাজমিডের বৈশিষ্ট্য হলো-

- এগুলো দ্বি-সূত্রক DNA গঠিত স্বতন্ত্র জেনেটিক বস্তু।
- এগুলো ব্যাকটেরিয়ার মূল ক্রোমোসোম হতে ছোট ও আলাদা এবং অল্প সংখ্যক জিন ধারণ করে।
- এরা অর্ধরক্ষণশীল প্রক্রিয়ায় প্রতিলিপন ক্ষমতাসম্পন্ন।
- এরা অন্য প্লাজমিড বা ব্যাকটেরিয়ার মূল DNA অথবা অন্য যে কোনো জীবের DNA-এর সাথে পুনঃসমন্বয় করতে সক্ষম।
- এরা এক ব্যাকটেরিয়া হতে অন্য ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তর হতে সক্ষম।

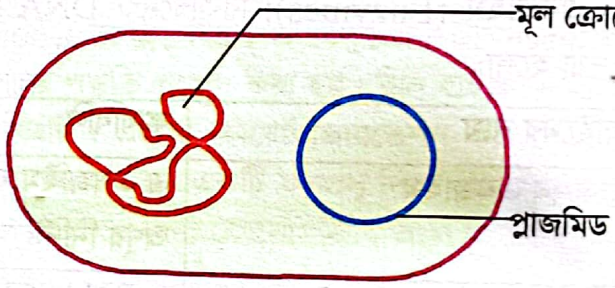

চিত্র ১১.৪ *Agrobacterium tumefaciens*-এর প্লাজমিড DNA

ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রধানত তিন ধরনের প্লাজমিড পাওয়া যায়, যথা-

(a) *F* factor-এরা এক ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়াতে জেনেটিক বস্তু স্থানান্তরের জন্য দায়ী;

(b) *R* plasmid –এরা ওষুধ প্রতিরোধের জন্য দায়ী এবং

(c) *Col* factor-এরা বিষাক্ত পদার্থ কোলিসিন উৎপাদন করার জন্য দায়ী।

ব্যাকটেরিয়াতে প্লাজমিডের সংখ্যা 1–1000 হতে পারে। ব্যাকটেরিয়ার কোষে একটি প্লাজমিড থাকলে তাকে একক কপি প্লাজমিড (single copy plasmid) এবং একাধিক প্লাজমিড থাকলে তাদের বহু কপি প্লাজমিড (multicopy plasmids) বলে। প্লাজমিড ক্ষুদ্র বৃত্তাকার DNA অণু নিয়ে গঠিত। প্লাজমিড এককভাবে অথবা কয়েকটি একসাথে শিকল গঠন করে থাকে। প্লাজমিডের আকার 1 মাইক্রোমিটার (μm) থেকে 30 মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

প্লাজমিডকে জিন প্রকৌশলের প্রধান ভেক্টর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশক্ষেত্রে *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডকে ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক প্লাজমিডগুলো ভেক্টর হিসেবে ভালো কাজ করে না। এজন্য এদের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য জিন প্রবেশ করিয়ে ব্যবহার উপযোগি করে তোলা হয়। এ কাজের প্রথমে রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে বৃত্তাকার প্লাজমিডকে নির্দিষ্ট এক বা একাধিক স্থানে কাটা হয়। পরে লাইগেজ এনজাইমের সাহায্যে

CamScanner

এক বা একাধিক অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য জিনকে (foreign gene) ঐ কাটা স্থানে সংযুক্ত করা হয়। এভাবে সৃষ্ট প্লাজমিডকে রূপান্তরিত প্লাজমিড (modified plasmid) বলে। জিন প্রকৌশলে অতি ব্যবহৃত রূপান্তরিত প্লাজমিড হলো pBR 322 এবং pUC series।

৫। পোষক (Host): জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিতে রিকম্বিনেন্ট DNA অণু তৈরির পর উহার সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য যে জীবে প্রবেশ করানো হয় তাকে পোষক বলে। সাধারণত ঈস্ট, ব্যাকটেরিয়া (*Escherichia coli*) ইত্যাদিকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পোষক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৬। জিন মার্কার (Gene marker): জীবের কোনো কোষ রিকম্বিনেন্ট DNA গ্রহণ করে পরিবর্তিত হয়েছে কি না তা শনাক্তকরণের জন্য জিন মার্কার ব্যবহার করা হয়। R-plasmid একটি অতি ব্যবহৃত জিন মার্কার যাতে টেট্রাসাইক্লিন অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন থাকে।

৭। DNA প্রোব (DNA Probes): কোনো DNA তে জিনের সিকুয়েন্স সঠিক আছে কিনা তা জানার জন্য DNA প্রোব ব্যবহার করা হয়। এগুলো সাধারণত 20-200 নিওক্লিওটাইডযুক্ত DNA অণু যাতে পরিচিতিমূলক লেবেল আটা থাকে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল (Process of genetic engineering)

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ নিম্নলিখিত ধাপগুলো ব্যবহৃত হয়:

১। কাঙ্খিত জিন সৃষ্টি ও পৃথককরণ: এ ধাপে কোনো জীবের জিনোম থেকে কাঙ্খিত জিনকে আলাদা করা হয়। একাজে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ এনজাইম ও DNA লাইগেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়। প্রথমে এন্ডোনিউক্লিয়েজ এনজাইম দ্বারা DNA কে সুনির্দিষ্ট স্থানে কেটে কাঙ্খিত জিন সৃষ্টি করা হয়। এগুলো স্টিকি প্রান্তযুক্ত DNA-এর একক সূত্রক যাদেরকে *DNA লাইগেজ* এনজাইম দ্বারা সংযুক্ত করা হয়।

২। কাঙ্খিত জিনকে উপযুক্ত ভেক্টরে স্থাপন: কাঙ্খিত জিনের DNA অত্যন্ত নাজুক ও দুর্বল প্রকৃতির হওয়ায় স্থানান্তর করার কারণে এটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এজন্য এদের নিরাপদ স্থানান্তরের জন্য দরকার হয় একটি বাহকের। তাই পৃথককৃত কাঙ্খিত জিনকে কোনো ভেক্টর বা বাহকের জিনোমে প্রবেশ করানো হয়। সাধারণত প্লাজমিড, কসমিড, ফায ইত্যাদিকে ভেক্টর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাঙ্খিত জিনকে ভেক্টরে স্থাপন করার জন্য পুনরায় *DNA লাইগেজ* এনজাইম ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ পদ্ধতিতে একটি রিকম্বিনেন্ট ভেক্টর (রিকম্বিনেন্ট DNA) সৃষ্টি করা হয়।

৩। রিকম্বিনেন্ট ভেক্টরকে পোষকে স্থানান্তর: রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড ভেক্টরকে কোনো একটি পোষকে স্থানান্তর করা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যেসব পোষক ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো:

- প্রোক্যারিয়টস: *E. coli, Bacillus substillus, Agrobacterium* sp. ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া।
- ছত্রাক: *Saccharomyces cervatiae* ঈস্ট।
- ইউক্যারিয়টস: যে কোনো উদ্ভিদ কিংবা প্রাণিকোষ।

রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড ভেক্টরকে পোষক কোষে এমনভাবে স্থানান্তর করা হয় যাতে এটি পোষকের জিনোমের সাথে সহজেই সংযুক্ত হয়ে যায়। সাধারণত ট্রান্সফরমেশন, ট্রান্সডাকশন, কনজুগেশন এবং লাইপোসোম, বোমবার্টমেন্ট পার্টিকল ব্যবহার করে স্থানান্তর কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৪। ক্লোনড কোষের বহুকপি ও পৃথককরণ: রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড ভেক্টরে কাঙ্খিত জিনের পাশাপাশি অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী প্রোব (probes) থাকায় অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে নন-ক্লোনড কোষগুলোকে নষ্ট করে ক্লোনড কোষ পৃথক করা হয়। ক্লোনড কোষগুলো আবাদ মাধ্যমে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। পোষক হিসেবে উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী ব্যবহার করলে এদেরকে চাষ বা লালন করে কাঙ্খিত উৎপাদ (desired product) তৈরি করা হয়।

প্রাণী থেকে উদ্ভিদে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল প্রয়োগ সহজ কেন?

নিম্নলিখিত কারণে প্রাণী থেকে উদ্ভিদে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল প্রয়োগ সহজ-

CamScanner

- উদ্ভিদে প্রাকৃতিক স্থানান্তর প্রক্রিয়া বিদ্যমান (*Agrobacterium tumefaciens*)
- উদ্ভিদের কলার পুনরুৎপাদন ক্ষমতা আছে। প্রাকৃতিকভাবেই এক টুকরা পাতা থেকে একটি সম্পূর্ণ উদ্ভিদ সৃষ্টি হতে পারে।
- উদ্ভিদের স্থানান্তর ও পুনরুৎপাদন ক্ষমতা অসংখ্য উদ্ভিদ প্রকরণে সহজ।

১১.৩ জিন ক্লোনিং (Gene cloning)

সাধারণভাবে ক্লোনিং হলো একটি নিখুঁত প্রতিরূপ তৈরি করা। তবে অধিকাংশক্ষেত্রে শব্দটি জিনতাত্ত্বিকভাবে অভিন্ন অনুলিপি সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। জীববিজ্ঞানে একটি সম্পূর্ণ জীবের পুনঃসৃষ্টিকে প্রজনন ক্লোনিং বা রিপ্রডাকটিভ ক্লোনিং (reproductive cloning) বলা হয়। একটি সম্পূর্ণ জীবকে ক্লোন করার প্রচেষ্টা চালানোর অনেক আগে গবেষকগণ শিখেছিলেন কিভাবে DNA এর ছোট অংশগুলোর অনুলিপি করতে হয়-যে প্রক্রিয়াকে জিন ক্লোনিং (gene cloning) বা আণবিক ক্লোনিং (molecular cloning) নামে আখ্যায়িত করা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট জিন বা DNA সিকোয়েন্স এর সঠিক অনুলিপি তৈরি করাকে জিন ক্লোনিং (gene cloning) বলা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে 'জিন ক্লোনিং', 'DNA ক্লোনিং', 'আণবিক ক্লোনিং', 'রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি' শব্দগুলোকে সমার্থক হিসেবে ধরা হয়। জিন ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে জিনের একাধিক অনুলিপি তৈরি করা, জিনের প্রকাশ ও নির্দিষ্ট জিন সম্পর্কে অধ্যয়ন করা যায়। এ প্রযুক্তিতে কোনো সুনির্দিষ্ট জিনসহ DNA অণুর অংশকে কোষের বাইরে ছেদন করে ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে প্রতিস্থাপন করা হয়। এভাবে গঠিত নতুন জিনকে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংখ্যায় বৃদ্ধি করা হয় এবং অন্য কাঙ্খিত জীবকোষে প্রবেশ করানো হয়। পরবর্তীতে এ জীবে নতুন জিনের বহিঃপ্রকাশকে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

DNA ক্লোনিং দুটি ভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা অর্জন করা যায়:

১। কোষ নির্ভর DNA ক্লোনিং: এটি একটি ইন ভিভো (in vivo) পদ্ধতি যেখানে একটি DNA খণ্ডককে কোনো একটি ভেক্টরে ক্লোন করা হয় এবং পরে একটি পোষকে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীতে DNA খণ্ডকসহ পোষকের সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়। *[কোনো পরীক্ষা বা কৌশল যখন কোনো একটি জীবের দেহাভ্যন্তরে ঘটানো হয় তখন তাকে ইন ভিভো পদ্ধতি বলে]*

২। কোষ মুক্ত DNA ক্লোনিং বা PCR কৌশল: পলিমারেজ চেইন রিয়েকশন বা PCR এমন একটি সাধারণ কৌশল যার মাধ্যমে DNA অণুর কোষ মুক্ত ক্লোনিং করা হয়। PCR হলো একটি ল্যাবরেটরি কৌশল যা DNA সিকোয়েন্স-এর সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য প্রযোগ করা হয়। এ পদ্ধতিতে জিনোমের নির্দিষ্ট অংশের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য DNA সিকোয়েন্স-এর একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহার করা। DNA সিকোয়েন্স-এর এ ক্ষুদ্র অংশকে প্রাইমার (primers) বলে।

পলিমারেজ চেইন রিয়েকশন বা PCR হলো একটি নির্দিষ্ট DNA নমুনার দ্রুতগতিতে মিলিয়ন-বিলিয়ন অনুলিপি (আংশিক বা সম্পূর্ণ) তৈরি করার ব্যাপক ব্যবহৃত একটি কৌশল। এ কৌশল ব্যবহার করে বিজ্ঞানীগণ একটি ক্ষুদ্র DNA নমুনা থেকে অসংখ্য অনুলিপি তৈরি করার মাধ্যমে বিস্তারিত গবেষণার সুযোগ পায়। আমেরিকান জৈব রসায়নবিদ ক্যারি বি মূলিস (Kary B. Mullis) 1983 সালে PCR কৌশল আবিষ্কার করেন এবং এ আবিষ্কারের জন্য তাঁকে 1993 সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

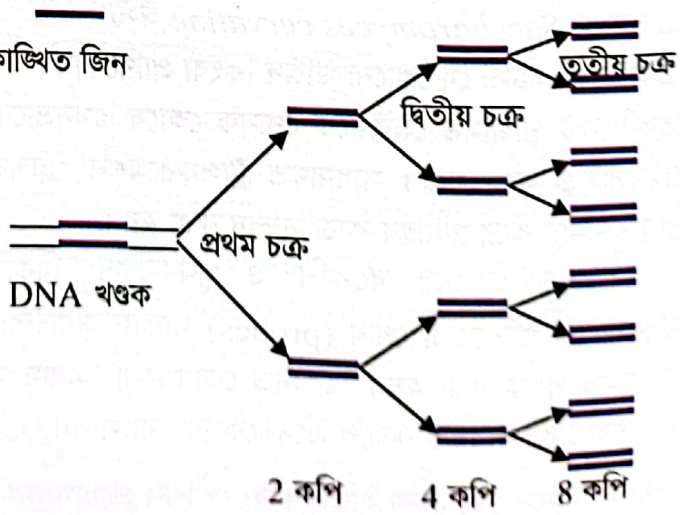

চিত্র: ১১.৫ পলিমারেজ চেইন রিয়েকশন

CamScanner

PCR কৌশলের প্রয়োগ: PCR কৌশলের মাধ্যমে বিস্তৃত উৎস থেকে প্রাপ্ত DNA খণ্ডকের সংখ্যাবৃদ্ধি করা যাওয়ার কারণে এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের জেনেটিক রোগ নির্ণয় করতে এবং ভাইরাস আক্রমণের নিম্নমাত্রা নির্ণয় করতে PCR কৌশল ব্যবহার করা হয়। দাতাকে তার জেনেটিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট দ্বারা সনাক্ত করতে ফরেনসিক মেডিসিনে রক্ত ও অন্যান্য টিস্যুর মিনিট ট্রেস বিশ্লেষণে (analyze minute traces) PCR কৌশল ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষিত টিস্যু যেমন-বরফে সংরক্ষিত 40,000 বছরের লোমশ ম্যামথ কিংবা পিট বগে প্রাপ্ত 7,500 বছরের মানুষের DNA খণ্ডকের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে PCR কৌশল ব্যবহার করা হয়।

জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড ব্যাকটেরিয়াম সৃষ্টি বা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি

মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী *E. coli* ব্যাকটেরিয়া দ্বারা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধিকাংশ কৌশল আবিষ্কার করা হয়েছে। একটি জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড ব্যাকটেরিয়াম সৃষ্টি বা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি নিম্নলিখিত 7টি ধাপে সম্পন্ন হয়-

ধাপ-1: কাঙ্খিত জীবের কোষ থেকে নির্দিষ্ট জিন সমন্বিত DNA অণুকে পৃথক করা হয়। এজন্য সিজিয়াম ক্লোরাইড (CsCl) বা সুক্রোজ দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। অনেকসময় নিউক্লিওটাইডের সাহায্যে গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে জিন তৈরি করা হয়।

ধাপ-2: নির্বাচিত DNA-র কাঙ্খিত অংশকে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ এনজাইম (restriction endonuclease enzyme) দ্বারা ছেদন করে পৃথক করা হয়। পৃথককৃত DNA-র প্রান্তদ্বয় **স্টিকি প্রান্ত** (sticky edge) ধরনের।

ধাপ-3: *E. coli* ব্যাকটেরিয়া হতে প্লাজমিড DNA-কে বের করে একে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ এনজাইম দ্বারা কেটে কাঙ্খিত DNA-র অনুরূপ অংশ বের করে নেয়া হয়।

ধাপ-4: কাঙ্খিত পৃথককৃত DNA খণ্ডককে DNA-ligase এনজাইম দ্বারা প্লাজমিড DNA-র কর্তিত ফাঁকা স্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়। এতে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি হয়।

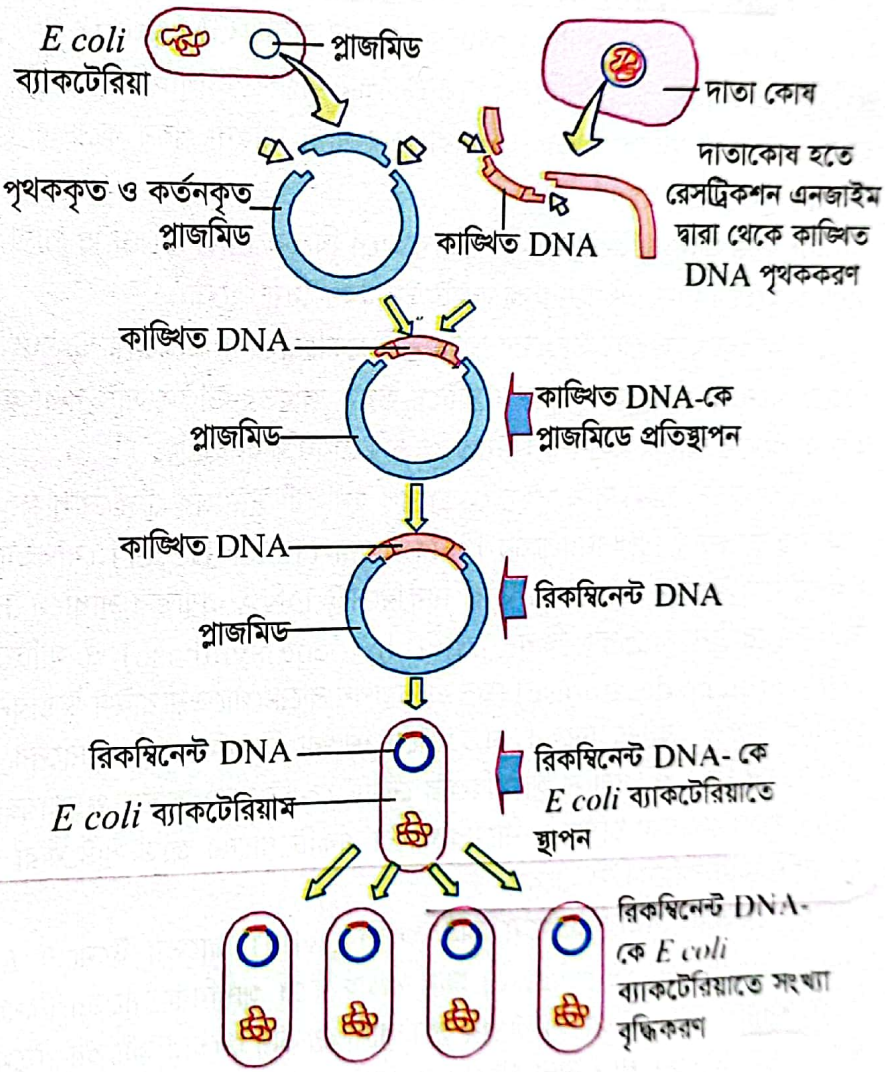

চিত্র: ১১.৬ রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির প্রযুক্তি বা জিন ক্লোনিং প্রযুক্তি

ধাপ-5: রিকম্বিনেন্ট DNA তে জিনের সিকুয়েন্স সঠিক আছে কি না পিসিআর ও সিকুয়েন্সার যন্ত্রের মাধ্যমে তা পরীক্ষা করা হয়।

ধাপ-6: রিকম্বিনেন্ট DNA অণুকে পরে কোনো পোষকে প্রবেশ করানো হয়। এক্ষেত্রে *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়াকেই পোষক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ধাপ-7: একটি কালচার মাধ্যমে রিকম্বিনেন্ট DNA বহনকারী পোষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রয়োজনমত রিকম্বিনেন্ট DNA সংগ্রহ করা হয় এবং জিন প্রকৌশলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

CamScanner

১১.৪ জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার (Use of biotechnology)

কৃষি উৎপাদনে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি

বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জনগণের খাদ্য চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে দেশ ও জাতির সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো জনগণের খাদ্য চাহিদা পূরণ করা। দেশ খাদ্যে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য জীবপ্রযুক্তিবিদগণ রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির প্রয়োগ করে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটানো কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ প্রযুক্তি দ্বারা বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উচ্চ ফলনশীল, রোগ প্রতিরোধক্ষম, খরা ও লবণ সহিষ্ণু ফসলের বিভিন্ন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি আবিষ্কারের পর অণুজীব এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে জেনেটিক বস্তুর আদান প্রধান ঘটিয়ে জেনেটিক পুনর্বিন্যাস সৃষ্টির সুযোগ হয়েছে। **রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি দ্বারা সৃষ্ট জীবকে ট্রান্সজেনিক জীব (transgenic organism) বা জিনতাত্ত্বিক রূপান্তরিত জীব (genetically modified organism-GMO)** বলে। GMO থেকে উৎপাদিত শস্যকে জি এম শস্য (GM crop) এবং খাদ্যকে জেনেটিক খাদ্য (genetic food) বলে। পুষ্টি চাহিদা পূরণ, পরিবেশ বান্ধব বালাই নাশক, আগাছা নাশক ইত্যাদি তৈরির জন্য GMO সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব উন্নত জীব দারিদ্র পীড়িত জনসাধারণের খাদ্য চাহিদা পূরণ করে এবং পরিবেশবান্ধব বালাইনাশক ব্যবহারের দ্বারা পরিবেশ দূষণ রোধ হয়।

বিশ্বজুড়ে জীবপ্রযুক্তিবিদগণ বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন GM উদ্ভিদ ও প্রাণী তৈরি করেছেন এবং এগুলো বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্নে এধরনের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো:

১। অধিক ফলনশীল উদ্ভিদের জাত সৃষ্টি: কোনো বন্য উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট জিন ফসলী উদ্ভিদে প্রতিস্থাপিত করে কিংবা জিনের গঠন বা বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নত জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এভাবে ধান, গম, তৈলবীজ সহ অনেক শস্যের অধিক ফলনশীল উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

২। গোল্ডেন রাইস সৃষ্টি: সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ইনগো পোট্রাইকাস (Ingo Potrykus) ও জার্মানির ফ্রিইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিটার বায়ার (Peter Beyer) যৌথভাবে 2000 সালে গোল্ডেন রাইস নামক এক ধরনের ধান উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে Japonica টাইপ ধানে ড্যাফোডিল উদ্ভিদের বিটা ক্যারোটিন সংশ্লেষক জিন *psy* (phytoene synthase) ও মাটির ব্যাকটেরিয়া *Erwinia uredovora*-এর *crtI* (carotene desaturase) জিন প্রতিস্থাপন করে গোল্ডেন রাইস উদ্ভাবন করেন। এ ধানের চাল দেখতে গোল্ডেন বা সোনালি বর্ণের এবং এ চালের ভাত খেলে শিশুরা ভিটামিন ও আয়রনের অভাবজনিত রোগে আক্রান্ত হয় না। এতে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার কোটি কোটি শিশু অন্ধত্ব ও আয়রনের অভাবজনিত রোগ থেকে রক্ষা পাবে। 2005 সালে গোল্ডেন রাইস-২ নামের আরো একটি ধানের জাত সৃষ্টি করা হয় যাতে পূর্ববর্তী গোল্ডেন রাইস থেকে 23 গুণ বেশি বিটা ক্যারোটিন থাকে।

৩। ফ্লেভার সেভার টমেটো সৃষ্টি: জংলি (wild) জাতের টমেটো *Lycopersicon escolentum* থেকে PG (polygalacturonase reverse) জিন সংগ্রহ করে আধুনিক জাতের টমেটোতে (*Lycopersicon lycopersicum*) প্রবেশ করিয়ে আমেরিকার ক্যালজেন কোম্পানি ফ্লেভার সেভার জাতের টমেটো (CGN-89564-2) সৃষ্টি করেছে। এর স্বাদ ও গন্ধ উন্নত। PG জিন থাকার কারণে এ টমেটো দেরিতে পাকে, সহজে পচে না এবং দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান প্রভৃতি দেশে এ টমেটোর চাষ অনুমোদিত হয়েছে।

৪। পতঙ্গরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি: আলু, তুলা, গম, আপেল ইত্যাদি উদ্ভিদে পতঙ্গরোধী (i) *Bacillus thuriengiensis* ব্যাকটেরিয়ার *Bt toxin* gene, (ii) Cowpea এর *CpTi* gene স্থাপন করা হয়েছে। ফলে এসব উদ্ভিদের পাতা পোকায় ভক্ষণ করলে 48 ঘণ্টার মধ্যে এদের মৃত্যু হয়।

বিটি বেগুন (*Bt* brinjal): বিটি বেগুন হলো জিনগতভাবে পরিবর্তিত বেগুনের একটি জাত। মাটিতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া *Bacillus thuriengiensis* এর ক্রিস্টাল প্রোটিন জিন বেগুনের বিভিন্ন জাতের জিনের সাথে মিশিয়ে এ *Bt* বেগুনের জাত সৃষ্টি করা হয়েছে। এ জেনেটিক পরিবর্তনের সময় আরো কিছু অ্যান্টিবডি প্রতিরোধকারী জিন ও

CamScanner

জীবাণু প্রতিরোধকারী জিনের সমন্বয় ঘটানো হয়েছিলো। এসব জেনেটিক মডিফিকেশনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো বেগুনের একটি কীট ও রোগ প্রতিরোধকারী জাত উদ্ভাবন করা। ভারতের মহারাষ্ট্রভিত্তিক একটি কোম্পানি মায়ায়কো বেগুনের এজাত সৃষ্টি করে। *Bt* বেগুন বাংলাদেশে চাষযোগ্য প্রথম জেনেটিক্যালি মডিফাইড বা GM ফসল যার কয়েকটি জাত (*Bt* Uttara, *Bt* Kajla, *Bt* Nayantara, and *Bt* ISD006) চাষের জন্য 2014 সালের 22 জানুয়ারি 20 জন কৃষকের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

ফ্লেভার সেভার টমেটো

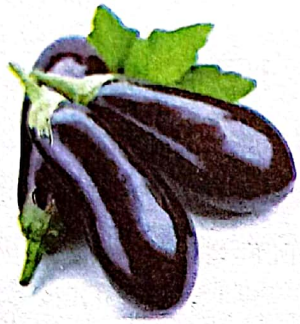

বিটি বেগুন

গোল্ডেন রাইস

ট্রান্সজেনিক ছাগল

চিত্র: ১১.৭ বিভিন্ন GM জীব

৫। **হার্বিসাইড প্রতিরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি:** বিভিন্ন ফসলী উদ্ভিদের মধ্যে আগাছানাশক (herbicides) প্রতিরোধী জিন প্রতিস্থাপন করে তাদের মধ্যে প্রতিরোধী ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে কাঙ্খিত উদ্ভিদের ক্ষতিসাধন না করেই আগাছানাশক ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যায়।

৬। **গুণগত মান উন্নয়নে:** জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রাণী ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদির গঠন, বর্ণ, পুষ্টিগুণ, স্বাদ ইত্যাদির উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। যেমন- অস্ট্রেলিয়ায় ভেড়ার লোমকে উন্নতমানের করতে ক্লোভার ঘাসে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে সূর্যমুখীর সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টিকারী জিন স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে খাদ্য হিসেবে এ ঘাস খেলেই ভেড়ার লোম উন্নতমানের হচ্ছে, পৃথকভাবে সালফার সমৃদ্ধ খাবার দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

৭। **নাইট্রোজেন স্থিতিকরণে:** লিগিউমোনাস জাতীয় উদ্ভিদের মূলে *Rhizobium* গণের ব্যাকটেরিয়া বায়ুস্থ নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে নডিউল (nodule) সৃষ্টি করে। এসব ব্যাকটেরিয়া হতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন (nitrogen fixation) নিয়ন্ত্রক *nifH gene* ধান গাছের (*Oriza sativa*) ক্রোমোসোমে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ফলে ধান গাছে নাইট্রোজেন সংবন্ধন ক্ষমতা সৃষ্টি হওয়াতে ইউরিয়া সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

৮। **দ্যুতিময় উদ্ভিদ সৃষ্টিতে:** জোনাকি পোকার আলোক বিচ্ছুরক লুসিফেরিন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে তামাক গাছে স্থানান্তর করে তাকে দ্যুতিময় করা হয়েছে। এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনেক ঘরশোভা উদ্ভিদকে দ্যুতিময় করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৯। **ভিটামিন সমৃদ্ধ ভুট্টার জাত উদ্ভাবন:** স্পেনের লিয়ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. পল ক্রিস্টো (Dr. Paul Christo) ও তাঁর সহকর্মীরা 2009 সালে *ভিটামিন সি*, *বিটা ক্যারোটিন* ও *ফলিক অ্যাসিড* সমৃদ্ধ জিনগত রূপান্তরিত $M_{37}W$ নামের ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করেন যা উন্নয়শীল দেশের কোটি মানুষের ভিটামিনের অভাব পুরণ করবে।

১০। **রোগ প্রতিরোধক্ষম উদ্ভিদের জাত উদ্ভাবন:** জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধক্ষম বিভিন্ন উদ্ভিদের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১১। **নতুন প্রকরণ সৃষ্টিতে:** জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণীতে নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন-রাই জাতীয় সরিষা হতে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যের জিন নিয়ে গমের কয়েকটি প্রকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে।

১২। **ট্রান্সজেনিক প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্টি:** রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে আখাঙ্খিত কোনো জিনকে কোনো প্রাণিদেহে স্থাপন করাকে **ট্রান্সফেকশন** (transfection) বলে। এপদ্ধতির প্রথমে রিকম্বিনেন্ট DNA উৎপাদন করা হয়। এ রিকম্বিনেন্ট DNA কে মাইক্রোইনজেকশনের মাধ্যমে প্রাণীর নিষিক্ত ডিম্বাণুর প্রোনিউক্লিয়াসে প্রবেশ করানো হয়।

CamScanner

রূপান্তরিত ডিম্বাণুকে মাতৃপ্রাণীর জরায়ুতে স্থাপন করে ভ্রূণের পরিস্ফুটন ঘটানো হয়। এভাবে উদ্ভাবিত প্রাণীকে ট্রান্সজেনিক প্রাণী (transgenic animal) বলে। ট্রান্সজেনিক প্রাণী স্বাভাবিক প্রাণী হতে অনেক উন্নতমানের হয়।

বিভিন্ন কারণে ট্রান্সজেনিক প্রাণী উৎপাদন করা হয়, যেমন-

- আখাঙ্খিত কোনো বৈশিষ্ট্যকে গৃহপালিত পশু-পাখিতে অনুপ্রবেশ করানো।
- গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষুধ তৈরি করা।
- অধিক পরিমানে দুধ, মাংস ও মাছ উৎপাদন এবং উন্নত মানের পশম উৎপাদন।
- ট্রান্সজেনিক প্রাণীর দুধ, মূত্র ও রক্ত থেকে মূল্যবান প্রোটিন সংগ্রহ করা।
- জিনের বহিঃপ্রকাশ বা অন্য কোনো মৌলিক জৈবিক প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান করা ইত্যাদি।

চিত্র ১১.৮ ট্রান্সজেনিক প্রাণী

বিশ্বের সর্বত্র গবেষণাগারে ট্রান্সজেনিক ইঁদুর উৎপাদন করা একটি নিয়মমাফিক কাজ। এদের মাধ্যমে স্তন্যপায়ীতে বিভিন্ন জিনের বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করা হয়। এরা মানবদেহের সম্ভাব্য ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন জিন স্থানান্তর ভেক্টর ও পদ্ধতির মডেল হিসেবে কাজ করে। ইঁদুরের দেহে এ পর্যন্ত কয়েকশ ট্রান্সজিনের সফল পরীক্ষা সম্ভব হয়েছে এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা গেছে এরা বংশগতির স্বাভাবিক নিয়ম মেনে পোষকের জিনোমের সাথে স্থানান্তরিত হয়।

1982 সালে প্রথম সফলভাবে ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবন করা হয়। এরপর থেকে বিশ্বে জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষি ও চিকিৎসাক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা চলছে। ট্রান্সজেনিক প্রাণীর চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রথম সফলতা হলো মানুষের antithrombin III উৎপাদন যা ট্রান্সজেনিক ছাগলের দুধ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এটি মানুষের বংশগত রোগ **অ্যান্টিথ্রম্বিন ডিফিসিয়েন্সি** (antithrombin deficiency) চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। ট্রান্সজেনিক প্রাণীর দ্বিতীয় সফলতা হলো মানুষের C12 esterase inhibitor উৎপাদন যা ট্রান্সজেনিক খরগোসের দুধ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এটি মানুষের বংশগত রোগ **অ্যানজিওডেমা** (angiodema) চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

GMO এর সুবিধাসমূহ

১। এসব খাদ্যের গুণগত মান উন্নত।
২। ফসলের অধিক ফলন হয় এবং পরিবেশীয় পীড়ন সহ্য করতে পারে।
৩। জীবাণু, পোকা ও আগাছা প্রতিরোধী হয়।
৪। গৃহপালিত প্রাণীদের গুণগত মান বৃদ্ধি করে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।
৫। এগুলো পরিবেশ বান্ধব এবং এদের ব্যবহার দ্বারা পরিবেশ দূষণ রোধ হয়।
৬। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান মানবগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণে জি এম খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট শুষ্ক ও লবণাক্ত পরিবেশে জি এম শস্য উৎপাদন করা যায়।
৭। অল্প জমিতে অধিক খাদ্য উৎপাদন করা যায়।

GMO এর অসুবিধাসমূহ

১। জি এম ফুডের অতিরিক্ত আমিষ মানবদেহে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।
২। এ খাদ্য অনেকসময় এলার্জি সৃষ্টি করে।
৩। এগুলো স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
৪। দেশী জাতের প্রাকৃতিক শস্য হারিয়ে যেতে পারে।
৫। জিনের বিশুদ্ধতা নষ্ট হতে পারে।
৬। খাদ্য উৎপাদন কৃষক পর্যায় থেকে কোম্পানি পর্যায়ে চলে যাবে এতে সাধারণ মানুষ খাদ্যের জন্য কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে যাবে।
৭। স্বাভাবিক বাজার ব্যবস্থা অসাধু ব্যবসায়ীর হাতে চলে যেতে পারে।

CamScanner

চিকিৎসা ও ওষুধ শিল্পে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি

মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে। বর্তমানে এ প্রযুক্তি দ্বারা সৃষ্ট প্রায় 600 ধরনের ওষুধ ও ভ্যাক্সিন বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

১। মানব ইনসুলিন উৎপাদন : মানুষের ডায়াবেটিক রোগের চিকিৎসায় ইনসুলিন হরমোন ব্যবহার করা হয়। পূর্বে গরু ও শুকরের অগ্ন্যাশয় হতে বাণিজ্যিকভাবে এ হরমোন সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন ব্যাকটেরিয়াতে স্থাপন করে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে বাণিজ্যিকভাবে ইনসুলিন উৎপাদন করা হয়। ফলে এটি যেমন সহজলভ্য হয়েছে তেমনি এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও নেই।

২। মানব গ্রোথ হরমোন উৎপাদন : মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী সোমাটোট্রফিন হরমোন উৎপাদনকারী জিনকে ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে জুড়ে দিয়ে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে বাণিজ্যিকভাবে মানব গ্রোথ হরমোন উৎপাদন করা হয়। এ হরমোন বামনত্ব চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

৩। ইন্টারফেরন উৎপাদন: ইন্টারফেরন হলো এক ধরনের উচ্চ আণবিক ওজন সম্পন্ন প্রোটিন যা ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি ও ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে বাধা দেয়। 1957 সালে অ্যালেক ইস্যাক (Alec Issacs) ও জ্যাঁ লিনডেনম্যান (Jean Lindenmann) সর্বপ্রথম মানবদেহে ভাইরাস প্রতিরোধী যৌগ ইন্টারফেরন আবিষ্কার করেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার দু-একদিনের মধ্যেই মানবদেহের অধিকাংশ কোষ ইন্টারফেরন উৎপন্ন করে। ইন্টারফেরন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। বর্তমানে *E. coli* ও ঈস্ট হতে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে ইন্টারফেরন উৎপাদন করা হয় যা হেপাটাইটিস-B, হার্পিস, প্যাপিলোমা, জলাতঙ্ক ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৪। ভ্যাক্সিন: প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য টিকা বা ভ্যাক্সিন ব্যবহার করা হয়। পূর্বে প্রাণিদেহ হতে অ্যান্টিজেন পৃথক করে ভ্যাক্সিন উৎপাদন করা হতো। বর্তমানে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ভ্যাক্সিন (টিকা) উৎপাদন করা হয় যেগুলো হাম, পোলিও, যক্ষ্মা, বসন্তসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

৫। AAT প্রোটিন উৎপাদন: AAT (a-1-antitrypsin) মানুষের যকৃত সৃষ্ট এক ধরনের প্রোটিন। দেহে এর অভাবে ফুসফুসের এমফাইসেমা (emphysema) রোগ হয়। দাতার রক্ত থেকে AAT প্রোটিন সংগ্রহ করে রোগীর দেহে প্রয়োগ করে এরোগের চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু মানুষের রক্তে এর পরিমাণ খুবই নগণ্য। বর্তমানে জিন প্রকৌশল প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিকভাবে AAT প্রোটিন উৎপাদন করা হচ্ছে।

৬। মানব জিন থেরাপি : জিন প্রকৌশল প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত ভাইরাসকে জিন থেরাপি প্রক্রিয়ায় মানুষের রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত জিনগত ত্রুটিজনিত রোগের ক্ষেত্রে জিন থেরাপি ব্যবহার করা হয়।

৭। কঙ্কাল পুনর্গঠন ওষুধ: টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং প্রক্রিয়ায় মানুষের অস্থি, কোমলাস্থি এবং পেশি পুনর্গঠনের ওষুধ তৈরি করা হচ্ছে।

৮। বংশগতিয় রোগ নিরাময়ে : মানুষের প্রায় তিন হাজার বংশগতিয় রোগ আছে। এসব রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। যেসব জিন দ্বারা এসব রোগ সৃষ্টি হয় জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি দ্বারা সেসব জিনকে অপসারণ বা প্রতিস্থাপন করে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা চলছে।

৯। গর্ভের শিশু পরীক্ষা: মাতৃগর্ভের শিশু কোনো বংশগত বা অন্য কোনো অস্বাভাবিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে কি না তা অ্যামনিওসিস নামক জিন প্রযুক্তি দ্বারা নিরূপণ করা যায়।

১০। বায়োরিয়েকটর: জিন প্রকৌশল প্রযুক্তিতে সৃষ্ট ট্রান্সজেনিক প্রাণীকে বায়োরিয়েকটর হিসেবে ব্যবহার করে এসব প্রাণীর দুধ, রক্ত ও মূত্র থেকে ওষুধ আহরণ করা হয়। একে মলিকুলার ফার্মিং (molecular farming) বলে।

১১। এনজাইম উৎপাদন: জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগ করে খাদ্য হজমকারী বিভিন্ন এনজাইম, যেমন- জাইমেজ, প্রোটিয়েজ, লাইপেজ; কৃমিনাশক এনজাইম ফাইসিন ইত্যাদি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হয়।

CamScanner

সারণি ১: রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত ওষুধ

উৎপাদ (Products)	প্রয়োগ (Application)
১। ইন্টারফেরন	ক্যান্সার ও ভাইরাসজনিত সংক্রমণে
২। হিউমেন ইউরোকাইনেজ (tPA)	রক্ত সংবহন জটিলতা, প্লাজমিনোজেন সক্রিয়ক
৩। ইনসুলিন	ডায়াবেটিকস চিকিৎসায়
৪। হিউমেন ফ্যাক্টর IV	হিমোফিলিয়ার চিকিৎসায়
৫। লিম্ফোলাইনস	স্বয়ংক্রিয় ইমিউন কার্যকারিতা
৬। সেরাম অ্যালবুমিন	শল্য চিকিৎসায়
৭। র‍্যাবিস ভাইরাস অ্যান্টিজেন	জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসায়
৮। টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর	হৃৎরোগ চিকিৎসায়
৯। সোমাটোস্ট্যাটিন	বামনত্ব চিকিৎসায়

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদন

ইনসুলিন

ইনসুলিন হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন যা মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (Islets of Langerhance) গ্রন্থির বিটা (β) কোষগুচ্ছ হতে ক্ষরিত হয়। ইনসুলিন শর্করা বিপাক ঘটিয়ে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এ হরমোন ক্ষরণ কমে গেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে মানবদেহে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় তাদের সামগ্রিকভাবে ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে। এরোগ নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য বাইরে থেকে ইনসুলিন হরমোন গ্রহণ করতে হয়।

ইনসুলিন আবিষ্কার

স্যার এডওয়ার্ড শারপে শ্যাফার (Sir Edward Sharpy Schafer) 1916 সালে মানুষের অগ্ন্যাশয় থেকে ক্ষরিত ইনসুলিন আবিষ্কার করেন। কানাডিয়ান শারীরবিজ্ঞানী ব্যানটিং ও বেস্ট (Banting and Best) 1921 সালে ইনসুলিনের ডায়াবেটিস প্রতিরোধী ভূমিকার কথা বর্ণনা করেন। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রেডরিক স্যাঙ্গার (Frederick Sanger) 1954 সালে মানব ইনসুলিনের অ্যামিনো অ্যাসিড সিকুয়েন্স আবিষ্কার করেন এবং এজন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ফ্রেডরিক স্যাঙ্গার এর বর্ণনানুযায়ী মানব ইনসুলিনে 17 ধরনের মোট 51টি অ্যামিনো অ্যাসিড দুটি পলিপেপটাইড শিকলে (শিকল A=21 ও শিকল B=30) বিন্যস্ত থাকে। দুটি পলিপেপটাইড শিকল দুটি ডাইসালফাইড সেতু (disulfide bridges) দ্বারা সংযুক্ত থাকে যেখানে সালফার অণু ও সিস্টিন অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে বন্ধন দিয়ে গঠিত।

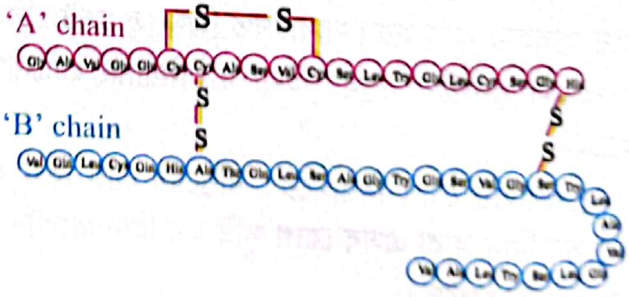

চিত্র ১১.৯: দুটি অ্যামিনো অ্যাসিড শিকল

ইনসুলিন উৎপাদন

মানবদেহে ইনসুলিনের অভাব পূরণের জন্য ইলি লিলি নামক ওষুধ কোম্পানি 1923 সালে শুকর ও গরুর অগ্ন্যাশয় হতে ইনসুলিন সংগ্রহ করে মানুষের ব্যবহার উপযোগি করে বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করে। কিন্তু এ ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি ছিল। 1954 সালে ইনসুলিনের রাসায়নিক গঠন আবিষ্কারের পর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশুদ্ধ মানব ইনসুলিন উৎপাদনের জন্য গবেষণা চলতে থাকে। 1977 সালে ইটাকুরা (Itakura) এবং তাঁর সহকর্মীরা

CamScanner

মানব ইনসুলিনের দুটি শিকলের DNA বিন্যাস সংশ্লেষ করতে সক্ষম হন। 1980 সালে ডেনমার্কের Novo Industry শুকরের ইনসুলিনকে 99% বিশুদ্ধ মানব ইনসুলিনে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়। 1981 সালে ক্যালিফোর্নিয়ার Hope National Medical Center-এর বিজ্ঞানীরা *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডের সাহায্যে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশুদ্ধ মানব ইনসুলিন উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। নিম্নলিখিত কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করে রিকম্বিনেন্ট DNA পদ্ধতিতে মানব ইনসুলিন উৎপাদন করা হয়-

ধাপ-১: মানব ইনসুলিনের দুটি পলিপেপটাইড শিকলের (DNA) অ্যামিনো অ্যাসিড সিকুয়েন্সের অনুরূপ সিকুয়েন্স বিশিষ্ট দুটি পলিপেপটাইড শিকল (DNA) কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষ করা হয়। শিকল A তৈরিতে 63টি এবং ও শিকল B তৈরিতে 90টি নিউক্লিওটাইড ব্যবহৃত হয়।

ধাপ-২: *Escherichia coli* থেকে প্লাজমিড আলাদা করে রেসট্রিকশন এনজাইম (restriction enzyme) দ্বারা উহার বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ জিন (β-*galactosidase*) অংশে কর্তন করা হয়।

ধাপ-৩: প্লাজমিডের কর্তিত স্থানে কৃত্রিম পলিপেপটাইড শিকল A অথবা শিকল B-কে DNA-ligase এনজাইম দ্বারা সংযুক্ত করে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করা হয়। দুটি শিকলের জন্য দুটি পৃথক প্লাজমিড ব্যবহার করা হয়।

ধাপ-৪: রিকম্বিনেন্ট DNA তে জিনের সিকুয়েন্স সঠিক আছে কি না পিসিআর ও সিকুয়েন্সারের মাধ্যমে তা পরীক্ষা করা হয়।

ধাপ-৫: এরপর প্রতিটি রিকম্বিনেন্ট DNA অণুকে পৃথক পোষক ব্যাকটেরিয়ার (*Escherichia coli*) দেহে প্রবেশ করিয়ে উহাকে উপযুক্ত কালচার মাধ্যমে স্থাপন করা হয়।

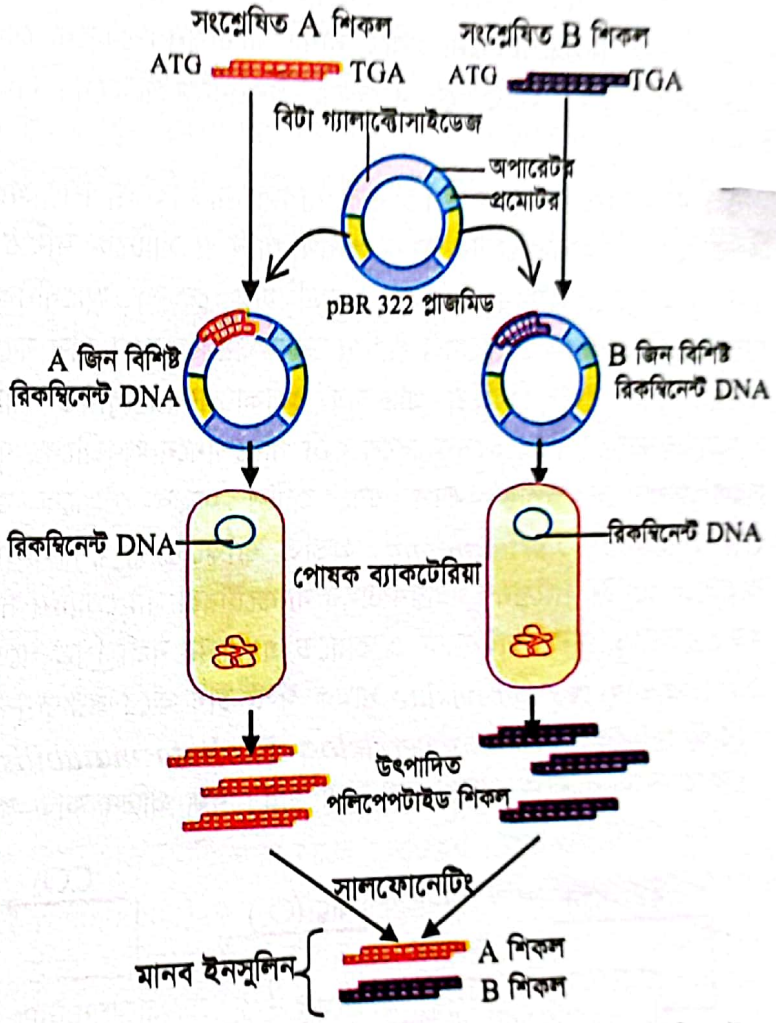

চিত্র ১১.১০ মানব ইনসুলিন তৈরির জৈব প্রযুক্তি/ রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি

ধাপ-৬: কালচার মাধ্যমে রিকম্বিনেন্ট DNA বহনকারী পোষক ব্যাকটেরিয়া আত্মপ্রজনন ঘটিয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করে এবং বিপুল পরিমাণ পলিপেপটাইড শিকল উৎপাদন করে।

ধাপ-৭: উৎপাদিত শিকল A ও শিকল B কে সালফোনেটিং পদ্ধতিতে একীভূত করে বিশুদ্ধ মানব ইনসুলিন সংশ্লেষ করা হয়।

ইলি লিলি কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত মানব ইনসুলিনই আমেরিকার Food and Drug Administration (FDA) কর্তৃক প্রথম অনুমোদিত জিন প্রকৌশল প্রযুক্তিতে উৎপাদিত ওষুধ যা 1982 সালে হিউমুলিন (Humulin) নামে বাজারজাত করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের নামকরা অনেক ওষুধ কোম্পানি যেমন- জেনিনটেক, নভো ইন্ডাস্ট্রি, বায়োজেন, ইলি লিলি প্রভৃতি রিকম্বিনেন্ট-DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত বিশুদ্ধ মানব ইনসুলিন বিভিন্ন ব্রান্ডে বাজারজাত করছে।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় জীবপ্রযুক্তি

বিশ্ব পরিবেশ আজ চরমভাবে দূষণের শিকার। এটি ক্রমেই মানুষসহ অন্যান্য জীবের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা ও জীবের বসবাসের উপযোগি পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা। পরিবেশের দূষণ মাত্রা কমিয়ে জীবের বাসযোগ্য অবস্থা সৃষ্টি করাই হলো পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য। তবে অনেকক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ার উপজাত হিসেবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়। মানুষের কৃতকর্মের ফলেই প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণ ঘটছে। সুতরাং পরিবেশের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য মানুষকেই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্ব পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য চলছে নানা আয়োজন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে। যেসব ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার চেষ্টা চলছে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

১। **কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :** বিভিন্ন শিল্পকারখানা থেকে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব বর্জ্য পরিবেশে নির্গত হয়। শিল্পজাত যেসব দূষক পদার্থ পানি ও মাটিকে দূষিত করে সেগুলোর মধ্যে সায়ানাইড, লেড, মারকারি, কপার, জিঙ্ক, ক্রোমিয়াম, ক্লোরিন, ক্যাডমিয়াম, ফেনল, আর্সেনিক, নিকেল, লোহা, অ্যামোনিয়া, সালফার, অ্যাসিড, ক্ষার প্রভৃতি প্রধান। এসব বর্জ্য পানির জীবনধারণ ক্ষমতা হ্রাস করে, খাদ্যশৃঙ্খল বিনষ্ট করে এবং অনেক প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়। উন্নত বিশ্বে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কলকারখানার দূষিত পানিকে পরিশোধন করে জলাশয়ে মুক্ত করা হয়। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের অনেক দেশে বর্জ্য পরিশোধনে অণুজীবের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। অণুজীব জৈব বর্জ্যকে ভেঙ্গে সরল উপাদানে রূপান্তর করে এবং জটিল ধাতব যৌগকে জারিত করে পুনঃব্যবহার উপযোগি করে তুলে। *Clostrodium, Pseudomonus* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া পেট্রোলিয়াম বর্জ্যের হাইড্রোকার্বন মুক্ত করে নিজ দেহের অভ্যন্তরে প্রোটিন সংশ্লেষণ ঘটায়। এসব ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট প্রোটিন সংগ্রহ করে মানুষ ও পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ফ্রান্স, জাপান, তাইওয়ান ও ভারতে এধরনের বর্জ্য শিল্প গড়ে উঠেছে। কাগজ মিলের বর্জ্যে *Torula utilis* ও *Saccharomyces cerevisiae* নামক ঈস্ট চাষ করে গুরুত্বপূর্ণ অ্যামিনো অ্যাসিড সংগ্রহ করা হয়। ক্লোরিন বর্জ্য মিশ্রিত পানিতে *Tremetes versiclor, Pholiota mutabilis, Phlebia subserialis* প্রভৃতি প্রজাতির ছত্রাক ব্যবহার করে পানিকে ক্লোরিনমুক্ত করা যায়। দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত কারখানার বর্জ্য থেকে অণুজীবের মাধ্যমে ল্যাকটিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।

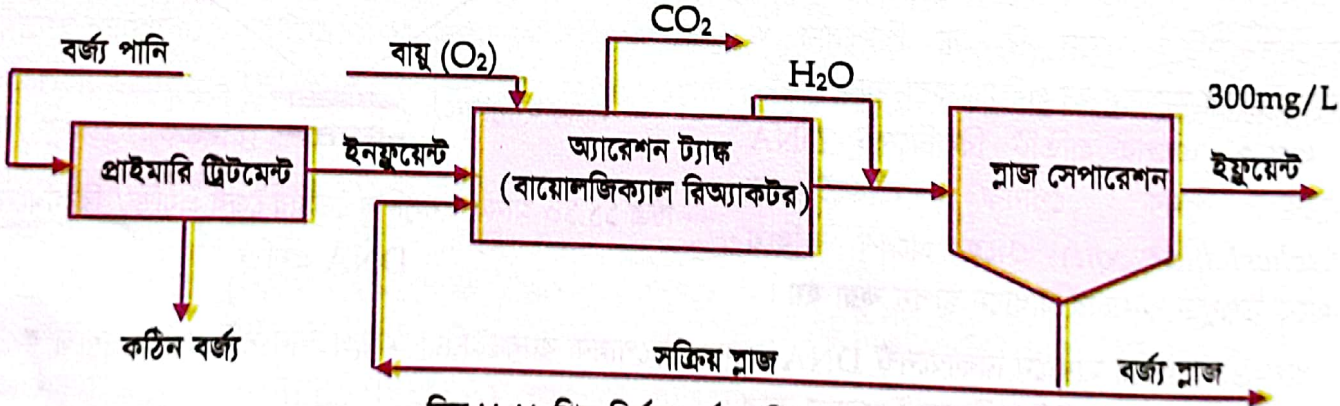

চিত্র ১১.১১ শিল্প নির্গত বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনার ফ্লো চার্ট

২। **পানিতে নির্গত পেট্রোলিয়াম তেল ব্যবস্থাপনা :** বিভিন্ন উপায়ে সমুদ্র ও নদীতে পেট্রোলিয়াম তেল অবমুক্ত হয়ে পানি দূষণ ঘটায়। সাধারণত তেলবাহী ট্যাঙ্কারে দুর্ঘটনা, তেল শোধণাগারের বর্জ্য, জলযানের ইঞ্জিনরুম ধোয়া পানি, তেল পাইপ লাইনে লিকেজ প্রভৃতি কারণে পেট্রোলিয়াম দূষণ ঘটে। পেট্রোলিয়াম অত্যন্ত হালকা বলে পানির উপরে অতি সূক্ষ্ম একটি স্তর সৃষ্টি করে। ফলে পানিতে বিদ্যমান ফাইটোপ্লাঙ্কটনের সালোকসংশ্লেষণ ব্যাহত করে এবং অনেক জলজ জীবের জীবন বিপন্ন করে। পানিতে বিদ্যমান *Pseudomonus, Nocardia, Mycobacterium* প্রভৃতি হাইড্রোকার্বন অক্সিডাইজিং অণুজীব পেট্রোলিয়ামকে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ভেঙ্গে সরল উপাদানে পরিণত করতে সক্ষম। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রক্রিয়ায় এসব অণুজীবের উন্নত প্রকরণ সৃষ্টি করে সমুদ্রের পেট্রোলিয়াম দূষণ রোধ করার চেষ্টা চলছে।

CamScanner

৩। **সিউয়েজ আত্মীকরণ:** ঘরবাড়ি, পাড়া-মহল্লা, কৃষি খামার, গোয়ালঘর, পোল্ট্রি খামার ইত্যাদি হতে নির্গত মানুষ ও পশুপাখির মলমূত্র ও গোসলখানার সাবান-ডিটারজেন্ট সমৃদ্ধ তরল আবর্জনাকে সিউয়েজ (sewage) বলে। সিউয়েজের প্রধান উপাদান পানি। এছাড়া এতে থাকে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থ এবং বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবী। বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে সিউয়েজ সমস্যা কম হলেও বড় শহরগুলোতে সিউয়েজ সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। বৃষ্টির পানির সাথে সিউয়েজ পরিবাহিত হয়ে প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোকে দূষিত করে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেটসহ অনেক শহরের অধিকাংশ জলাশয়ই সিউয়েজ দূষণে দূষিত। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন শহরে সিউয়েজ আত্মীকরণের বড় বড় প্লান্ট বা শোধনাগার স্থাপন করা হয়। এসব শোধনাগারে জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সিউয়েজ আত্মীকরণ করা হয়। প্রক্রিয়ার শুরুতে সিউয়েজ থেকে কাঁদা, বালি অন্যান্য অজৈব পদার্থকে যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে পৃথক করা হয়। এরপর সিউয়েজে বায়বীয় বা অবায়বীয় অণুজীব ব্যবহার করা হয়। এরা সিউয়েজের জৈব বর্জ্যকে ভেঙ্গে মিথেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি করে। উৎপন্ন মিথেন শোধনাগারে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উপজাত তরল পানিকে জলাশয়ে অবমুক্ত করা হয় অথবা তাপের মাধ্যমে বিশুদ্ধ করে বোতলজাত করে বিক্রি করা হয়।

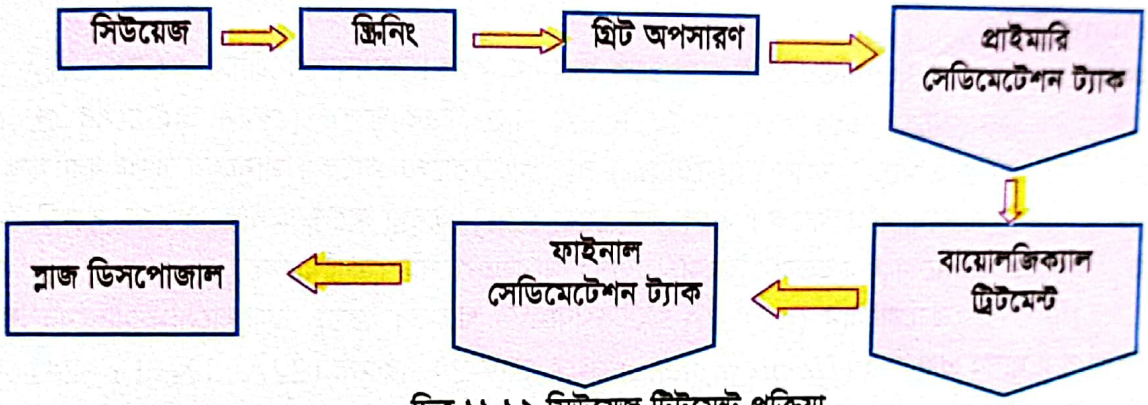

চিত্র ১১.১২ সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়া

৪। **রাসায়নিক কীটনাশক, আগাছানাশক ও সার ব্যবহার হ্রাসকরণ:** রাসায়নিক কীটনাশক, আগাছানাশক ও সার পরিবেশের জন্য অত্যন্ত বিপদজনক। জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া (*Bacillus thorangenesis*) ও ভাইরাস (Nuclear polyhedrosis virus-NPV) দ্বারা কীটনাশক তৈরি করা হচ্ছে যেগুলোর ব্যবহার পরিবেশবান্ধব। জিন প্রকৌশল পদ্ধতি দ্বারা পতঙ্গ প্রতিরোধি (insect resistance) ও আগাছা প্রতিরোধি (weed resistance) ফসলি উদ্ভিদের জাত তৈরি করা হয়েছে যেগুলোর চাষাবাদ ভবিষ্যতে কীটনাশক ও আগাছানাশক ব্যবহার হ্রাস করে। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জীবপ্রযুক্তিতে উৎপাদিত বায়োফার্টিলাইজারের ব্যবহার পরিবেশ বিপর্যয় হ্রাস করবে। বর্তমান বিশ্বে নিম্নলিখিত বায়োফার্টিলাইজার ব্যাপক ব্যবহৃত হচ্ছে-

- মিথোজীবি নাইট্রোজেন সংবন্ধক- *Rhizobium* sp., *Bradyrhizopium sp.*
- মুক্তজীবী নাইট্রোজেন সংবন্ধক- *Azobacter sp.*, *Azospirillum sp.*
- ফসফেট দ্রবণকারী ব্যাকটেরিয়া- *Thiobacillus*, *Bacillus*.
- বিভিন্ন জৈবসার- গোবর, গোমূত্র, শহরের গৃহস্থালীয় বর্জ্য, সিউয়েজ, খড়, খৈল ইত্যাদি।

৫। **বিষাক্ত জমি পুনরুদ্ধার:** অতিমাত্রার রাসায়নিক কীটনাশক ও আগাছানাশক প্রয়োগ, বিষাক্ত বর্জ্য জমাকরণ (waste disposal) প্রভৃতি কারণে অনেক জমির মাটির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। এসব জমির উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে বর্তমানে জিন প্রকৌশল দ্বারা বিশেষভাবে রূপান্তরিত জীবাণু (modified microbe) ব্যবহার করা হচ্ছে।

৬। **পরিবেশে দূষক পদার্থ নির্ণয়ে বায়োসেন্সর ব্যবহার:** বায়োসেন্সর হলো এমন একটি যন্ত্র যার দ্বারা পরিবেশে বিদ্যমান বিশেষ উপাদান যেমন- চিনি, আমিষ, হরমোন, দূষক পদার্থ এবং বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত পদার্থ শনাক্ত করা যায়। এ যন্ত্র দ্বারা এসব উপাদানের পরিমাণও নির্ণয় করা যায়। শিল্প কারখানা ও ওষুধ কারখানার আশেপাশের পরিবেশে বিভিন্ন পদার্থের উপস্থিতি বায়োসেন্সর দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

৭। **অবক্ষয়িত ভূমির পুনরুদ্ধার:** নগরায়ন এবং মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপে জীবের বাসযোগ্য ভূমির প্রতিনিয়ত অবক্ষয় ঘটছে। জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা এসব অবক্ষয়িত ভূমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়:

- পুনর্বনায়নের জন্য মাইক্রোপ্রোপাগেশন (micropropagation) ও মাইকোরাইজার (mycorrhiza) ব্যবহার।
- মাটির অনুর্বরতা দূর করার জন্য লিগিউম জাতীয় উদ্ভিদের সাথে *Rhizobium* এবং অন্যান্য উদ্ভিদের সাথে *Frankia* নাইট্রোজেন সংবর্দ্ধন ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার।
- পীড়ন সহনশীল উদ্ভিদের জাত সৃষ্টি যেগুলো অবক্ষয়িত ভূমিতে জন্মাতে পারে।
- ভূমি থেকে বিষাক্ত পদার্থ অপসারণের জন্য জিন প্রকৌশল দ্বারা রূপান্তরিত কিছু সুনির্দিষ্ট অণুজীব যেমন *Thiobacillus ferroxidans*, *Ganoderma lucidum* ইত্যাদির ব্যবহার।

১১.৫ জিনোম সিকুয়েন্সিং (Genome sequencing)

জিনোম (Genome)

জীবের সকল জেনেটিক বা বংশগতিয় তথ্য ভাণ্ডারকে জিনোম বলে। অধিকাংশ জীবে এগুলো DNA সাংকেতিক রূপে ক্রোমোসোমে অবস্থান করে। তবে অনেকক্ষেত্রে RNA সাংকেতিকরূপেও (যেমন-ভাইরাসের ক্ষেত্রে) থাকে। কোনো কোনো জীবে এরা প্লাজমিডে (যেমন ব্যাকটেরিয়া) বা ক্লোরোপ্লাস্টে থাকে। মানুষের কথা ধরা যাক। মানুষের প্রতিটি দেহকোষে 46টি ক্রোমোসোম থাকে। একে ডিপ্লয়েড (2n) অবস্থা বলে অর্থাৎ এখানে দুসেট ক্রোমোসোম (n+n) আছে। মানুষের জননকোষে (শুক্রাণু কিংবা ডিম্বাণু) মাত্র একসেট ক্রোমোসোম (n) থাকে এবং এতে 22টি অটোসোম এবং 1টি সেক্স ক্রোমোসোম (n =22A+X অথবা Y) থাকে। সেক্স ক্রোমোসোম মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ করে। এতে বুঝা যায় মানব প্রজাতির (*Homo sapiens*) দেহে মোট 24 ধরনের (22A+1X+1Y=24) ক্রোমোসোম থাকে। মানুষের সকল বৈশিষ্ট্যের নীল নক্সা (blue print) এ 24 ধরনের ক্রোমোসোমে লুকায়িত থাকে। আর মানুষের জিনোম বলতে এ 24 ধরনের ক্রোমোসোমে বিদ্যমান সকল বংশগতিয় তথ্য বা জিন বা DNA এর সমাহারকে বুঝায়। সুতরাং সহজভাবে বলা যায়, কোনো জীবের সকল ধরনের একসেট ক্রোমোসোমে বিদ্যমান সকল বংশগতিয় তথ্য বা জিন বা DNA এর সমাহারকে জিনোম বলে। জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী হ্যানস উইনকার (Hans Winkler) 1920 সালে সর্বপ্রথম জিনোম শব্দটি ব্যবহার করেন।

জিনোম সিকুয়েন্সিং (Genome sequencing)

DNA তে চার ধরনের নাইট্রোজেন ক্ষারক (A, T, C এবং G) নির্দিষ্ট অনুক্রমে সজ্জিত থাকে। কোনো জীবের জিনোমে নাইট্রোজেন ক্ষারকগুলো কীভাবে সজ্জিত থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তা নির্ণয় করার পদ্ধতিতে জিনোম সিকুয়েন্সিং (genome sequencing) বলে। ব্রিটিশ রসায়নবিদ ফ্রেডরিক স্যাঙ্গার (Frederick Sanger) 1977 সালে এ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এজন্য তাকে 1980 সালে দ্বিতীয়বার রসায়নে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

জিনোম সিকুয়েন্সিং এর প্রয়োগ (Application of genome sequencing)

জিনোম সিকুয়েন্সিং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছে। এর মাধ্যমে তাঁরা জীবের জেনেটিক তথ্যকে মেডিসিন, কৃষি ও ফরেনসিক গবেষণার কাজে ব্যবহার করছে। এ পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে 'হিউমেন জিনোম প্রজেক্ট' সফলভাবে সম্ভব হচ্ছে। নিম্নে জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর কয়েকটি প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো:

১। **ফরেনসিক বিজ্ঞানে:** প্রতিটি মানুষের একটি অনুপম বা নিজস্ব DNA সিকুয়েন্স থাকে। এজন্য বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে ফরেনসিক বিজ্ঞানে DNA সিকুয়েন্সিং প্রয়োগ করা হয়। অপরাধী ও সন্তানের পিতা মাতা শনাক্তকরণে DNA সিকুয়েন্সিং করা হয়। এছাড়া বিলুপ্তপ্রায় ও সংরক্ষিত বন্যপ্রাণী শনাক্তকরণে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

CamScanner

২। চিকিৎসা বিজ্ঞানে: বংশগত রোগ নির্ণয়ে এবং জিন থেরাপির মাধ্যমে এসব রোগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে জিনোম সিকুয়েন্সিং প্রয়োগ করা হয়। বর্তমানে অধিক ব্যবহৃত অনেক বেশী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন রাসায়নিক ওষুধের পরিবর্তে জৈবিক ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অণুজীবের জিনোম সিকুয়েন্সিং কাজে লাগানো হচ্ছে।

৩। কৃষি বিজ্ঞানে: কৃষি বিজ্ঞানে জিনোম সিকুয়েন্সিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অণুজীবের জিনোম সিকুয়েন্সিং দ্বারা কৃষিবিজ্ঞানীগণ এদেরকে শস্য ও খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার করছে। যেমন ব্যাকটেরিয়ার সুনির্দিষ্ট কিছু জিনকে ব্যবহার করে কয়েকটি ফসলি উদ্ভিদের রোগ ও বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া এধরনের জিন ব্যবহার দ্বারা গবাধিপশুর দুধ ও মাংস উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

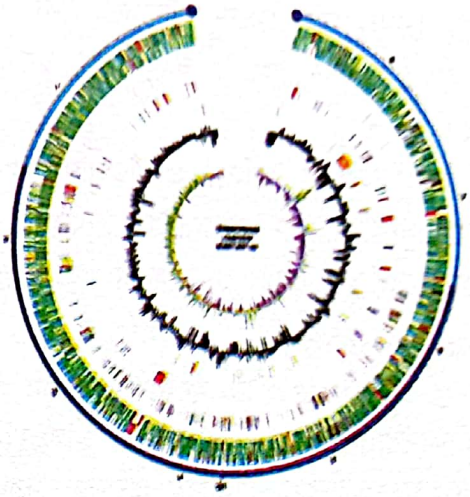

চিত্র ১১.৯ একটি ব্যাকটেরিয়ার জিনোম সিকুয়েন্স

৪। মশা নিয়ন্ত্রণে: জিনোম সিকুয়েন্সিং প্রযুক্তি দ্বারা ডেঙ্গু রোগের বাহক *Aedes* মশা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। অক্সিটেক নামে এক কোম্পানির ব্রিটিশ গবেষকগণ জিন পরিবর্তন করে এক ধরনের মশার জাত তৈরি করেছেন। এদের পুরুষরা বেঁচে থাকার উপযোগি বংশধর সৃষ্টি করতে পারে না। ডিম থেকে লার্ভা বের হওয়ার পর পরই তা মারা যায়। আর এভাবে ব্রাজিলের কয়েকটি শহরের 90% মশা কমানো গেছে।

৫। ক্যান্সার গবেষণায়: সোমাটিক ভেরিয়েশন ডিটেকশন, ট্রান্সক্রিপটোম সিকুয়েন্সিং, টিউমার ভাইরাস ডিটেকশন প্রভৃতি ক্যানসার সংক্রান্ত গবেষণায় জিনোম সিকুয়েন্সিং প্রয়োগ করা হয়।

৬। সমুদ্র গবেষণায়: পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ হলো সমুদ্র। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে এক চা চামচ সমুদ্রের পানিতে 10^9 ভাইরাস থাকে যা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচুর্যময় জেনেটিক বস্তুর স্থান। এসব জেনেটিক বস্তু সর্বদা ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তরিত হয়। জিনোম সিকুয়েন্সিং প্রয়োগ করে এ বিশাল জিন ভাণ্ডারের রহস্য উন্মোচণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

৭। উদ্ভিদ গবেষণায়: জিনোম সিকুয়েন্সিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করে উদ্ভিদের খরা, লবণাক্ততা ও রোগ প্রতিরোধক্ষম বৈশিষ্ট্যের জিন নির্ণয়ের মাধ্যমে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কিছু উদ্ভিদের জৈবিক জ্বালানি বা বায়োডিজেল উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। জিনোম সিকোয়েন্সিং এর মাধ্যমে এসব জিনকে চিহ্নিত ও আলাদা করে জিন প্রকৌশল পদ্ধতিতে বায়োডিজেল উৎপাদনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

৮। হিউমেন জিনোম প্রজেক্ট: জিনোম সিকুয়েন্সিং প্রযুক্তি দ্বারা মানুষের 24টি ক্রোমোসোমে বিদ্যমান 20,000-25,000 সক্রিয় জিনের 3 বিলিয়ন নিউক্লিওটাইড অণুর গাঠনিক বিন্যাস ও কাজের ধারা নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। এতে সময় লেগেছে প্রায় 13 বছর (1990-2003)।

১১.৬ জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

(Importance and prospects of biotechnology)

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। বন্য জীব-জন্তুকে পোষ মানানো, পশুপালন, উদ্ভিদের চারা উৎপাদন, কীটপতঙ্গ দমন, অসুখ সারানোর জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদের রস ব্যবহার ইত্যাদি সকল কিছুই জীবপ্রযুক্তির অবদান। সারাবিশ্বে 1996 সালে 1.7 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে জীবপ্রযুক্তিগত ফসলে চাষ হয়েছিল যা 2013 সালে 100 গুণ বৃদ্ধি পেয়ে 175 মিলিয়ন হেক্টরে দাড়িয়েছে। বিশ্বে মোট 27টি দেশে জীবপ্রযুক্তিগত ফসলের চাষ হয় যাদের 8টি শিল্পোন্নত এবং 19টি উন্নয়নশীল দেশ। বিশ্বের যে 5টি দেশ সর্বাধিক জীবপ্রযুক্তিগত ফসল উৎপাদন করে সেগুলো হলো: যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, আর্জেনটিনা, ভারত ও কানাডা। জীবপ্রযুক্তিগত

ফসল 1996 সাল থেকে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও পানামা 2013 সাল থেকে জীবপ্রযুক্তিগত ফসল চাষের অনুমতি পায়।

আধুনিককালে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তুর শিল্পোৎপাদন, কৃষিক্ষেত্র, চিকিৎসাক্ষেত্র, জিন প্রকৌশল, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ হচ্ছে। নিম্নে কয়েকটি শিরোনামে জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব

১। **কৃষিক্ষেত্রে**: উচ্চ ফলনশীল উদ্ভিদ ও অধিক উৎপাদনক্ষম প্রাণী সৃষ্টির মাধ্যমে জীবপ্রযুক্তি কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষিক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির বিশেষ অবদান হলো- ট্রান্সজেনিক প্রাণী ও উদ্ভিদ উৎপাদন; টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উদ্ভিদের প্রজনন; দূর সংকরায়ণের মাধ্যমে অধিক ফলনশীল ফসল উৎপাদন; রোগ-বালাই, আগাছানাশক প্রতিরোধি উদ্ভিদ সৃষ্টি; স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক (SIT) প্রযুক্তি দ্বারা পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ; নাইট্রোজেন স্থিতিকরণে সক্ষম অধিক ফলনশীল ফসল সৃষ্টি ইত্যাদি।

২। **চিকিৎসাক্ষেত্রে**: আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে জীবপ্রযুক্তির অবদান অনস্বীকার্য। চিকিৎসাক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির বিশেষ অবদান হলো: অণুজীব থেকে মানব ইনসুলিন, মানব গ্রোথ হরমোন, ইন্টারফেরন, ভ্যাক্সিন, এনজাইম প্রভৃতি উৎপাদন; ক্লোনিং; বংশগত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা, গর্ভের শিশু পরীক্ষা, ক্যান্সার নিরাময় ইত্যাদি।

৩। **শিল্পক্ষেত্রে**: জীবপ্রযুক্তিতে বহু রাসায়নিক শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করা হয় যেগুলো বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন- ইথানল, অ্যাসিটোন, বিউটানল, পলিমার ইত্যাদি। বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো- আখের চিটাগুড় ও ভুট্টা থেকে ইথানল উৎপাদন এবং জাত্রোফা (*Jatropha curcas*) নামক গাছ থেকে বায়োডিজেল উৎপাদন।

৪। **খাদ্য ও পানীয় উৎপাদনে**: জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে গুণগত মান সম্পন্ন খাদ্য ও পানীয় উৎপাদন করা হচ্ছে। যেমন - দই, মাখন, পনির, পাউরুটি, মাশরুম, মদ ইত্যাদি।

৫। **পরিবেশ রক্ষায়**: প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে জীবপ্রযুক্তির যেসব ব্যবহার দেখা যায় সেগুলো হলো: গৃহস্থালিয় বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, পয়ঃপ্রণালির বর্জ্য, কৃষিজ বর্জ্য ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ; সমুদ্রে ভাসমান পেট্রোলিয়াম অপসারণে অণুজীবের ব্যবহার; সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বায়োকোষ সৃষ্টি; কম্পিউটারের সিলিকন চিপসের পরিবর্তে বায়োচিপসের উদ্ভাবন; বায়োগ্যাস উৎপাদন ইত্যাদি।

৬। **খনিজ দ্রব আহরণে**: আকরিক হতে খনিজ পদার্থ আহরণে metal leaching নামক জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়। যেমন *Thiobacillus ferroxidans* নামক ব্যাকটেরিয়া কপার পাইরাইট হতে লোহা ও সালফারকে আলাদা করে দেয় যাতে সহজ উপায়ে কপার আহরণ করা যায়।

জীবপ্রযুক্তির সম্ভাবনা

বিশ্ব পর্যায়ে সৃষ্ট অনেক সমস্যা জীবপ্রযুক্তি দ্বারা সমাধান করা সম্ভব বলে আশা করা যায়। একবিংশ শতাব্দিতে দেশের সমৃদ্ধি ও অর্থনীতি জীবপ্রযুক্তির ব্যবহারের উপর নির্ভর করবে। কিছু ক্ষেত্রে এব্যাপারে বিপ্লব সাধিত হবে, যেমন- চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের যত্ন, কৃষি, শিল্প ও পরিবেশ। একবিংশ শতাব্দীর জীবপ্রযুক্তির কয়েকটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র এখানো উল্লেখ করা হলো:

১। **জিনোম স্ক্যানিং** (Genome Scanning): এ প্রযুক্তি দ্বারা খুব দ্রুত ও স্বল্প খরচে যে কোনো জীবের সম্পূর্ণ জিনোম সম্পর্কে জানা যাবে। এছাড়া ক্রোমোসোমে বিদ্যমান নিষ্ক্রিয় জিনের (প্রায় 97%) সম্পর্কে তথ্য উদঘাটিত হবে।

২। **স্টেম সেল** (Stem Cells): এ ধরনের কোষ দেহের যে কোনো অঙ্গের কোষ তৈরিতে সক্ষম হবে। ফলে নতুন আবিষ্কৃত ওষুধের পরীক্ষাগুলো আর অন্য প্রাণীর দেহে করতে হবে না। এছাড়া দুর্ঘটনায় হারানো অঙ্গের প্রতিস্থাপন সহজ হবে।

CamScanner

৩। **জিন থেরাপি এবং আরএনএ আই** (Gene Therapy and RNAi): বংশগতিয় রোগ, ক্যানসার এবং কিছু সংক্রামক জটিল রোগের চিকিৎসায় জিন থেরাপির প্রয়োগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী জিনকে সুস্থ জিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। এসব জিনের বাহক হিসেবে ভাইরাস, RNAi, অ্যান্টিসেন্স বা জিঙ্ক ফিঙ্গার প্রোটিন ব্যবহার করা হয়।

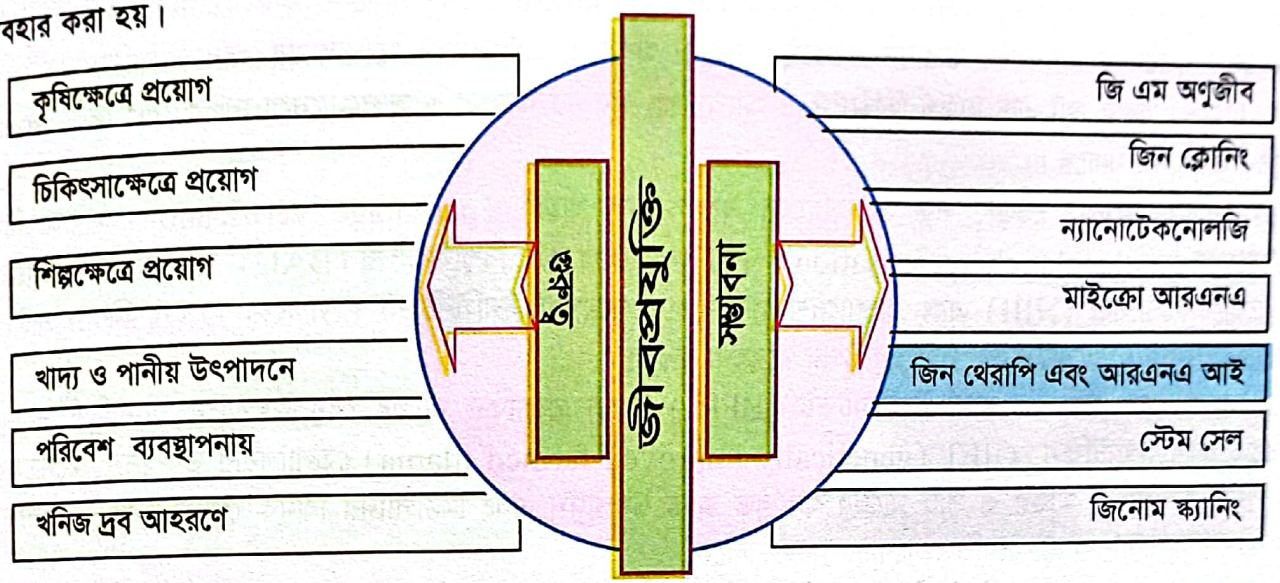

৪। **মাইক্রো আরএনএ** (MicroRNAs): ক্যানসার, ভাইরাস সংক্রমণ, বিপাক সমস্যা এবং প্রদাহজনিত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় মাইক্রো আরএনএ-এর ব্যবহার হতে পারে জীবপ্রযুক্তির এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। এটি রোগ সৃষ্টিকারী জিনের কাজকে প্রতিরোধ করে।

৫। **ন্যানোটেকনোলজি** (Nanotechnology): এ প্রযুক্তি দ্বারা পদার্থের আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের ইচ্ছেমতো জৈব বস্তুর উৎপাদন করা যায়। এ প্রযুক্তিতে উৎপাদিত বস্তু দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য সেবা ও খাদ্য নিরাপত্তার বিধান করা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

৬। **জিন ক্লোনিং** (Gene cloning): মানব কল্যাণে ব্যবহৃত অনেক উৎপাদ জিন ক্লোনিং বা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি দ্বারা পাওয়া যায় এবং বর্তমান দশকে আরো অনেক উৎপাদ প্রস্তুত করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৭। **জি এম অণুজীব** (GM microbe): জেনেটিক্যালি মডিফাইড অণুজীব ব্যবহার করে অনেক দেশে পরিবেশ দূষণ কমানো শুরু হয়েছে। এসব অণুজীব অধিকতর স্বাস্থ্য, অধিকতর উৎপাদ ও ভবিষ্যতের অপেক্ষাকৃত ভালো পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হবে।

জীবপ্রযুক্তি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকার সমস্যার সমাধান করে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে। এটি শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে নতুন সৃজনশীল কাজকে উৎসাহিত করে। অদুর ভবিষ্যতে আমাদের দেশে জীবপ্রযুক্তির অনেক ক্ষেত্র প্রসারিত হবে এবং খুলে দিবে সুন্দর ভবিষ্যতের দ্বার।

জীবপ্রযুক্তির সাফল্য: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

১। 1970 দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে পাটের টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম আধুনিক জীবপ্রযুক্তির সূচনা ঘটে। পরবর্তী 10-12 বছরের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারিভাবে বেশ কয়েকটি টিস্যু কালচার গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২। বর্তমানে অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট কোম্পানি (যেমন-বায়োটেক সিড, জেনেটিক সিড, গ্রামীন কৃষি ফাউন্ডেশন, ব্র্যাক, প্রশিকা, লাল তীর সিড কোম্পানি, ম্যাটেক্স বিডি লিঃ, সেইফ এগ্রি বিডি, ইস্ট-ওয়েস্ট সিড কোম্পানি) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প পণ্য উৎপাদন করছে।

৩। মলিকিউলার মার্কার ব্যবহার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের বিজ্ঞানীগণ লবণ সহিষ্ণু ধান, ঠাণ্ডা সহিষ্ণু পাট এবং পতঙ্গ প্রতিরোধি ডালের জাত উদ্ভাবন করেছেন।

CamScanner

৪। জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে ICDDR,B. সিগেলা ভ্যাক্সিন (Shigella vaccine) উৎপাদন করছে।

৫। বারডেম হাসপাতাল পি সি আর (PCR) পদ্ধতি দ্বারা যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস, এইডস এর মতো জটিল রোগের মলিক্যুলার ডায়াগনোসিস ও ক্যারিওটাইপং সেবা প্রদান করছে।

৬। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BLRI) ছাগলের প্লেগ, ছাগলের বসন্ত রোগ সহ গরু ও হাঁস-মুরগির বেশ কয়েকটি ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিনে প্রাণিসম্পদ সেবা বিভাগ (DLS) গরুর ফুট এন্ড মাউথ ডিজিসস ও অ্যানথ্রাক্স, মুরগির কলেরা ও সালমোনেলা নিউক্যাসল ডিজিসস-এর ভ্যাকসিন উৎপাদন করছে।

৭। দেশীয় ছাগল, ভেড়া, গরু ও মহিষের বংশপরিচয় যাচাই (parentage verification) ও আণবিক বৈশিষ্ট্যায়নের (molecular characterisation) জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BAU), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (NIB) এবং বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BLRI) DNA ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও মাইক্রোস্যাটেলাইট জিনোটাইপিং পদ্ধতির উপর গবেষণা করছে।

৮। বাংলাদেশ মৎস গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) বিপন্ন প্রজাতির মাছের রেণু উৎপাদন, নির্বাচিত প্রজনন পদ্ধতিতে কার্প, ক্যাটফিস, GIFT (genetically improved farmed tilapia) তেলাপিয়ার উৎপাদন, মনোসেক্স তেলাপিয়ার উৎপাদন, মাগুর ও পুটি মাছের হাইব্রিড জাত উৎপাদন এবং মিঠাপানির ঝিনুক থেকে মুক্তা উৎপাদনের লক্ষে বেশ কিছু মৌলিক জীবপ্রযুক্তির গবেষণা কাজ করছে।

৯। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (BAEC) তাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নিম্ন মাত্রার গামা রেডিয়েশন ব্যবহার করে রেশম উৎপাদন বৃদ্ধি, স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক (SIT) দ্বারা ফলের মাছি ও *Aedes* মশা নিয়ন্ত্রণ, হরমোন ও ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে সমন্বিত বালাই দমন (IPM) ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে।

১০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি বিভাগ মথ জাতীয় বালাই (pest) নিয়ন্ত্রণের জন্য *Bacillus thuringiensis* এর বিশেষ জাতের বৈশিষ্ট্যায়ন ও আলাদাকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১১। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার পরিষদ (BCSIR) আধুনিক আণবিক প্রযুক্তি (যেমন- DAS-ELISA, রিয়েল টাইম PCR, হাইব্রিডাইজেশন ইত্যাদি) ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসলি, ফলজ, বনজ, ওষুধি ও সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের প্যাথোজেন (ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া) শনাক্তকরণের প্রোটোকল উদ্ভাবন করেছে।

ড. মাকসুদুল আলম

ড. মারমা

ড. হাসিনা খান

ড. নিয়ামূল নাসের

ড. রিয়াজুল ইসলাম

বাংলাদেশের কয়েকজন জীবপ্রক্তুক্তিবিদ

১২। ড. মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে বাংলাদেশের একদল বিজ্ঞানী 2010 সালে পাটের জিনোমিক সিকুয়েন্স আবিষ্কার করেছেন। এ আবিষ্কারে ড. আলমের সহযোগি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমেস্ট্রি ও মলিক্যুলার বায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. হাসিনা খান এবং অধ্যাপক জেবা সিরাজ। 2008 সালে এ প্রকল্প শুরু হয়ে 2010 সালে শেষ হয়। পাটের জিনোম আবিষ্কারের জন্য তোষা জাতের (*Corchorus olitorius* O-4) পাটের Genomic DNA (gDNA) ব্যবহার করা হয়। জিনোমিক সিকোয়েন্স আবিষ্কার পাটের গুণগত মান উন্নয়নে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এর ফলে পাটের লবণাক্ততা সহনশীল ও পতঙ্গরোধি জাত উদ্ভাবন সহজ হবে বলে বিজ্ঞানী অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এতে সোনালি আঁশের সোনালি দিন ফিরে পাবে।

CamScanner

১৩। আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. মং সানো মারমা-র নেতৃত্বে বাংলাদেশের আরো একদল বিজ্ঞানী 2018 সালে ইলিশ মাছের (*Tenualosa ilisha*) জিনোমিক সিকুয়েন্স আবিষ্কার করেছেন। এ আবিষ্কারে ড. মারমা-র সহযোগি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমেস্ট্রি ও মলিক্যুলার বায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. হাসিনা খান ও অধ্যাপক ড. রিয়াজুল ইসলাম, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. নিয়ামূল নাসের, আমেরিকান বিজ্ঞানী ড. পেটার ইনাকিয়েভ।

১১.৬ জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগে জীবনিরাপত্তা বিধানসমূহ

(Biosafty policies in application of biotecnology)

মানুষ গত কয়েক শতাব্দি ধরে খাদ্য ও কৃষি শিল্পে জীবপ্রযুক্তির নীতিকে ব্যবহার করে আসছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিশেষ করে DNA প্রযুক্তি আবিষ্কারের পর থেকে জীবপ্রযুক্তি আধুনিক প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। DNA প্রযুক্তি দ্বারা বিশ্বে এখন ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে জিনগত রূপান্তরিত জীব (Genetically Modified Organisms - GMOs)। তবে সাথে সাথে বিশ্বের মানুষের একটি ধারণা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যে জীবপ্রযুক্তি দ্বারা উৎপাদিত এসব জিনগত রূপান্তরিত জীব বা খাদ্য মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে। ব্রিটিশ সরকার জিন প্রকৌশল দ্বারা সৃষ্ট খাদ্যশস্য বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য তিন বছর উৎপাদন নিষিদ্ধ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ যারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জি এম খাদ্য উৎপাদন করে, তারাই নিউজিল্যান্ডকে এ ধরনের খাদ্য উৎপাদন না করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছে। ইউরোপে জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগকৃত শেয়ার বাজারের মূল্য হ্রাস পেয়েছে। ব্রিটিশ বায়োটেক, ইউরোপের ফ্লাগশিপ বায়োটেকনোলজি কোম্পানি 50% এর অধিক শেয়ার মূল্য হারায়। প্রতিনিয়ত আমরা সবুজ বিপ্লব থেকে জিন বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। অনেক নতুন ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বীজ, ভ্রূণ ও শুক্রাণু সংরক্ষণ করা হয়েছে। একদিন আসবে যে দিন কৃষকরা জীবপ্রযুক্তি দ্বারা সৃষ্ট বীজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এটি আমাদের জন্য বুমেরাং হতে পারে। তাই জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগে জীবনিরাপত্তা বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

জীবনিরাপত্তা বলতে মানুষের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত জীবগোষ্ঠী বা জৈব অখণ্ডতাকে বড় ধরনের কোনো ক্ষতির হাত হতে রক্ষা করার নিশ্চয়তাকে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে জীবনিরাপত্তা বলতে কতগুলো নীতি ও পদ্ধতির সমষ্টিকে বুঝায় যা আধুনিক জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগকে পরিবেশ বান্ধব করবে। বিশ্বব্যাপি জীবনিরাপত্তা যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করে সেগুলো হলো:

১। হুমকিযুক্ত উন্নয়নশীল দেশের ও ছোট দ্বীপের ক্ষুদ্র ও ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র।
২। হুমকিযুক্ত জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ বিশাল এলাকা।
৩। হুমকিযুক্ত টেকসই কৃষি ও বন্যপ্রাণী।
৪। যেসব ক্ষেত্রে জীবনিরাপত্তা বিধানে সর্বনিম্ন সক্ষমতা থাকে।
৫। যেসব ক্ষেত্রে জীবনিরাপত্তা বিধানে তাৎক্ষণিক প্রযুক্তিগত দক্ষতা অপর্যাপ্ত।
৬। যেসব ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির 'সেন্টার অব একসিলেন্স (Centres of Excellence)' অনুপস্থিত।
৭। জীবপ্রযুক্তির দ্বারা সৃষ্ট জীবের সীমান্ত পারাপার নিয়ন্ত্রণে।
৮। জীবপ্রযুক্তি সম্পর্কে জনসচেতনা সৃষ্টিতে।

জীবনিরাপত্তায় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত (Biosafty: International context)

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ তাদের জাতীয় জীবনিরাপত্তা কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। আর এজন্য প্রাথমিকভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে একটি আঞ্চলিক জীবনিরাপত্তা কর্তপক্ষ (Regional Biosafety Authority-RBA) গঠনের। এ পর্যন্ত অনেকগুলো আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়েছে যেগুলোর বিশ্ব জীবনিরাপত্তাকে প্রভাবিত করতে পারে। এদের কয়েকটি হলো:

CamScanner

১। **কার্টাজেনা জীবনিরাপত্তা প্রটোকল** (The Cartagena Protocol on Biosafty): এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো GMO এর বিশ্বব্যাপী নিরাপদ ব্যবহার যাতে টেকসই জীববৈচিত্র্য এবং এদের সংরক্ষণের উপর যাতে কোনো প্রতিকূল প্রভাব না পড়ে।

২। **বাসেল কনভেনশন** (The Basel Convention): এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিপদজনক বর্জ্যসমূহের উৎপাদন, বিশ্বব্যাপি পরিবহন ও ব্যবস্থাপনা যাতে মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ না করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩। **আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ সুরক্ষা কনভেনশন** (The International Plant Protection Convention- IPPC): এ কনভেনশন স্থানীয় উদ্ভিদকে GMO ও বিদেশি প্রজাতির উদ্ভিদের প্রভাব হতে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণের রূপরেখা প্রণয়ন করে।

৪। **বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন চুক্তি** (The World Trade Organization Agreements): বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধিনে জীব নিরাপত্তা বিষয়ক বেশ কয়েকটি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, যেমন-

- Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
- Agreement on Technical Barriers to Trade
- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

জীবনিরাপত্তায় বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (Biosafty: Bangladesh Context)

কার্টাজেনা জীবনিরাপত্তা প্রটোকল এর সাথে সম্পর্কিত কোনো পরিপূর্ণ জাতীয় জীবনিরাপত্তা বিধান (National Biosafety Policy) এখনো আমাদের দেশে তৈরি হয়নি। এর একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে মাত্র। তবে বাংলাদেশে বর্তমান কয়েকটি প্রচলিত আইন জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগে জীবনিরাপত্তা নিশ্চিত করে। তাই এগুলোকে জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগে জীবনিরাপত্তার বিধান হিসেবে গণ্য করা যায়। আইনগুলো হলো:

১। পরিবেশ আইন 1992
২। বাংলাদেশের জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা 2004
৩। জাতীয় জীববৈচিত্র্য আইন, 2006
৪। বাংলাদেশের জীবনিরাপত্তা গাইডলাইন, 2006
৫। জাতীয় শস্য এবং বন জীবপ্রযুক্তি আইন, 2006
৬। জাতীয় মাছ এবং প্রাণী জীবপ্রযুক্তি আইন, 2006
৭। জাতীয় চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি আইন, 2006
৮। জাতীয় চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি গাইডলাইন, 2006

জাতীয় জীবনিরাপত্তা বিধান এর পরিসর ও উদ্দেশ্য

১। জাতীয় জীবনিরাপত্তা বিধান GMO-এর হস্তান্তর, আমদানি-রপ্তানি, গবেষণা ও ব্যবহার যাতে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর এবং স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার ও সংরক্ষণের উপর কোনো প্রতিকূল প্রভাব না ফেলে তার যথেষ্ট সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

২। জীবনিরাপত্তা বিষয়ক যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এ বিধান তদসংক্রান্ত পূর্বসতর্কতামূলক তথ্য প্রদান করে।

৩। জীবনিরাপত্তা বিষয়ক যে কোনো জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেটওয়ার্কিং কিংবা পর্যবেক্ষণ করার সময় এটি একটি কার্যকরি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদান করে।

৪। এটি স্থানীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা, প্রতিনিধি বা প্রতিষ্ঠানকে জীবনিরাপত্তা বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক ক্ষমতাকে শক্তিশালি করে।

৫। এটি জীবনিরাপত্তা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক বিষয়াদি বিবেচনায় আনে।

CamScanner

৬। এটি জীবনিরাপত্তা বিষয়ক সকলক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৭। এটি জীবনিরাপত্তা বিষয়ক নতুন নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনে নীতি ও আইন সংশোধনের ক্ষমতা রাখে।

জীবপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত:

১। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গ্রিন হাউজ তৈরি করে জি এম শস্য চাষাবাদ করতে হবে যাতে পরাগরেণু স্থানীয় জাতের শস্যের সাথে মিশ্রণের সুযোগ না পায়।

২। জি এম শস্য থেকে কোনো খাদ্য তৈরি করলে তাতে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো উপাদান আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

৩। জি এম শস্যের বীজ কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানির কাছে সীমাবদ্ধ না রেখে তা বিশ্বব্যাপি উন্মুক্ত করে দিতে হবে যাতে কৃষকরা বীজের জন্য কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে না পরে।

৪। জীবপ্রযুক্তিতে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী যাতে পরিবেশের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব না ফেলে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৫। জীবপ্রযুক্তিতে উৎপাদিত বস্তু লেবেলিং এর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য আইন জারি করতে হবে এবং তার দেশি ও আন্তর্জাতিক প্রয়োগ থাকতে হবে।

জীবপ্রযুক্তিগত খাদ্যের স্বাস্থ্যঝুঁকি (GMO Health Risk)

আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় জীবপ্রযুক্তিগত খাদ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় 80% প্রক্রিয়াজাত খাদ্যই জিন প্রকৌশল পদ্ধতিতে সৃষ্ট। এসব খাদ্যে কোনো লেবেলিং না থকায় ভোক্তাগণ জানে না যে তারা কি খাচ্ছে, ফলে বিপদ অবধারিত।

১। **জি এম সয়া এবং অ্যালার্জিক ক্রিয়া** (GM soy and allergic reactions): যুক্তরাষ্ট্রে জিন প্রকৌশলগত সয়াবিন (জি এম সয়া) প্রবেশের পর প্রায় 50% মানুষের অ্যালার্জি দেখা দিয়েছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে কিছু মানুষের জি এম সয়া খেলে ত্বকীয় অ্যালার্জি দেখা দেয় কিন্তু বন্য প্রাকৃতিক সয়া খেলে অ্যালার্জি দেখা দেয় না।

২। **বিটি কর্ন এবং অ্যালার্জিক ক্রিয়া** (Bt corn linked to allergies): বিটি জিন সমৃদ্ধ কর্ন খাদ্য মানবদেহে অ্যালার্জি সৃষ্টি করে বলে প্রমাণিত। সাধারণত বিটি জিন সমৃদ্ধ ফসল স্বাভাবিক ফসল হতে অধিক বিষাক্ত।

৩। **জি এম খাদ্য এবং যকৃত সমস্যা** (GMOs and liver problems): গবেষণায় দেখা গেছে জি এম আলু খাওয়ানো ইঁদুরের যকৃত আকারে ছোট ও অপুষ্ট ধরনের হয়। অন্যদিকে জি এম ক্যানোলা খাওয়ানো ইঁদুরের যকৃত স্বাভাবিকের চেয়ে 12-16% বড় হয়।

৪। **জি এম খাদ্য এবং প্রজনন সমস্যা** (GMOs and reproductive problems): পরীক্ষাগারে যে সব মা ইঁদুরকে জি এম খাদ্য খাওয়ানো হয় তাদের অর্ধেক বাচ্চা তিন সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়। জিম এম সয়া খাওয়ানো পুরুষ ইঁদুরের শুক্রাশয়ে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে।

৫। **বিটি ফসল-বন্ধ্যাত্ব রোগ ও মৃত্যু** (Bt crops-sterility, disease, and death): ভারতে বিটি তুলা উদ্ভিদের পাতা খেয়ে কয়েক হাজার ভেড়া, মহিষ ও ছাগলের মৃত্যু হয়েছে। এদের অনেকগুলো দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারি কিংবা নানান রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

৬। **মানবদেহে কার্যকরি জি এম জিন** (Functioning GM genes remain inside us): জি এম সয়া থেকে জি এম জিন মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়ার জিনোমে প্রবেশ করে। ফলে জি এম খাদ্য খাওয়া বন্ধ করলেও আমাদের দেহে জি এম জিন দ্বারা সর্বদা প্রোটিন তৈরি হতে থাকে।

- যদি জি এম খাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিক জিন থাকে তাহলে এরা দেহে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধক সুপার ডিজিস তৈরি করে।
- জি এম খাদ্যে বিটি জিন থাকলে অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়াগুলো জীবিত পেস্টিসাইডের ফ্যাক্টরিতে পরিণত হয়।

টিস্যু কালচার ও রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি-এর মধ্যে পার্থক্য

টিস্যু কালচার	রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি
১। টিস্যু কালচার হলো মূল জীব হতে আলাদা কোনো একটি কৃত্রিম মাধ্যমে টিস্যু বা কোষের বৃদ্ধি করানো।	১। রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি হলো নতুন কাঙ্খিত পণ্য উৎপাদনে দুটি ভিন্ন ধরনের DNA অণুকে যুক্ত করে কোনো পোষক দেহে বৃদ্ধি করানো।
২। এটি মাইক্রোপোপাগেশন নামে পরিচিত।	২। এটি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নামে পরিচিত।
৩। ভাইরাস ও রোগমুক্ত জীব উৎপাদনে এটি কৃষিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।	৩। জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত জীব উৎপাদনে এটি কৃষিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
৪। এটি তুলনামূলকভাবে কম জটিল প্রক্রিয়া।	৪। এটি তুলনামূলকভাবে অধিক জটিল প্রক্রিয়া।
৫। এ প্রক্রিয়ায় কোনো প্লাজমিড ব্যবহৃত হয় না।	৫। এ প্রক্রিয়ায় প্লাজমিড ব্যবহৃত হয়।
৬। জিন ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে জীবদেহের কোনো জিনোটাইপিক পরিবর্তন হয় না।	৬। জিন ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে জীবদেহের আবশ্যিক জিনোটাইপিক পরিবর্তন ঘটে।
৭। অপত্য উদ্ভিদে প্যারেন্ট উদ্ভিদের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য থাকে।	৭। অপত্য উদ্ভিদে প্যারেন্ট উদ্ভিদের ভিন্নরূপ বৈশিষ্ট্য থাকে।

ট্রান্সজেনিক প্রাণী ও ক্লোনড প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

ট্রান্সজেনিক প্রাণী	ক্লোনড প্রাণী
১। ট্রান্সজেনিক প্রাণী হলো এমন প্রাণী যাদের জিনোমে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি বাইরের জিন ঢোকানো হয়েছে।	১। ক্লোনড প্রাণী হলো ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট প্রাণী যেগুলো জেনেটিকেলি হুবহু কাঙ্খিত প্রাণীর মতো।
২। এ প্রাণীতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটে।	২। এ প্রাণীতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটে না।
৩। এক্ষেত্রে জিনোমিক পার্থক্য সৃষ্টি হয়।	৩। এক্ষেত্রে কোনো জিনোমিক পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।
৪। এক্ষেত্রে মিউটেশন সংঘটিত হয়।	৪। এক্ষেত্রে মিউটেশন সংঘটিত হয় না।
৫। প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে বৈসাদৃশ্যতা থাকে।	৫। প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে বৈসাদৃশ্যতা থাকে না।
৬। শুক্রাণু, ডিম্বাণু এবং জাইগোট ব্যবহৃত হয়।	৬। কেবল ডিম্বাণুর আবরণ ব্যবহৃত হয়।

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

- **জীবপ্রযুক্তি** : সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণীর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করে মানব কল্যাণকর প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করার পদ্ধতিকে বায়োটেকনোলজি বা জৈবপ্রযুক্তি বা জীবপ্রযুক্তি বলে।
- **টিস্যু কালচার** : টিস্যু কালচার এমন এক বিশেষ ধরনের কৌশল যেখানে উদ্ভিদের সজীব কোনো ক্ষুদ্র অংশ বা অংশের টিস্যুকে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত পুষ্টি মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আবাদ করে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে গবেষণা তথা অণুচারা উৎপাদনের ক্ষমতা যাচাই করা হয়।
- **জিন প্রকৌশল** : নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের DNA তে অন্য কোনো উৎসের DNA সংস্থাপনের মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে।
- **জিন ক্লোনিং** : যে পদ্ধতিতে জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং-এর কার্য সমাধা করা হয় তাকে জিন ক্লোনিং বা রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি বলা হয়।
- **পিসিআর** : পলিমারেজ চেইন রিয়েকশন বা PCR হলো একটি নির্দিষ্ট DNA নমুনার দ্রুতগতিতে মিলিয়ন-বিলিয়ন অনুলিপি (আংশিক বা সম্পূর্ণ) তৈরি করার ব্যাপক ব্যবহৃত একটি কৌশল।

CamScanner

- **ট্রান্সফেকশন** রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে আখাঙ্খিত কোনো জিনকে কোনো প্রাণিদেহে স্থাপন করাকে ট্রান্সফেকশন (transfection) বলে।
- **প্লাজমিড** : ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও যে বৃত্তাকার বা রিং আকৃতির দ্বিসূত্রক DNA থাকে তাকে প্লাজমিড বলে।
- **ট্রান্সজেনিক প্রাণী** : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে আখাঙ্খিত কোনো জিনকে কোনো প্রাণিদেহে স্থাপন করার মাধ্যমে যে প্রাণী সৃষ্টি করা হয় তাকে ট্রান্সজেনিক প্রাণী বলে।
- **জিনোম সিকুয়েন্সিং** : কোনো জীবের জিনোমে নাইট্রোজেন ক্ষারকগুলো কীভাবে সজ্জিত থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তা নির্ণয় করার পদ্ধতিতে জিনোম সিকুয়েন্সিং বলে।
- **ইনসুলিন** : ইনসুলিন হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন যা মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (Islets of Langerhance) গ্রন্থির বিটা (β) কোষগুচ্ছ হতে ক্ষরিত হয়।

অনুশীলনী

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

১. কোন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম Biotechnology শব্দটি ব্যবহার করেন?
ক. Janet Parker খ. Karl Erekh গ. Edward Jenner ঘ. John Clinch

২. টিস্যুকে কালচার প্রযুক্তির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো-
ক. বেশি টিস্যু উৎপাদন
খ. উন্নতমানের বীজ উৎপাদন
গ. নতুন জাতের টিস্যু সৃষ্টি
ঘ. বিভাজনক্ষম অঙ্গ থেকে নতুন চারা উৎপাদন

৩. গ্রিন বায়োটেকনোলজি কোনটি নিয়ে কাজ করে?
ক. সমুদ্রক্ষেত্র খ. কৃষিক্ষেত্র গ. চিকিৎসাক্ষেত্র ঘ. শিল্পক্ষেত্র

৪. নিচের কোনটি আণবিক কাঁচি নামে পরিচিত?
ক. প্লাজমিড খ. রেস্ট্রিকশন এনজাইম গ. লাইগেজ এনজাইম ঘ. ইন্টারফেরন

৫. রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি প্রয়োগে সৃষ্ট নতুন জীবকে কি বলে?
ক. ট্রান্সজেনিক খ. হাইব্রিড গ. সাইব্রিড ঘ. ক্লোন

৬. 'সাইব্রিড' শব্দটি নিচের কোন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ?
ক. গ্রাফটিং খ. জিন ক্লোনিং গ. টিস্যু কালচার ঘ. হাইব্রিডাইজেশন

৭. কোন এনজাইম দ্বারা প্লাজমিডের নির্দিষ্ট অংশ কাটা হয় ?
ক. রেস্ট্রিকশন খ. লাইগেজ গ. লাইপেজ ঘ. প্রাইমেজ

৮. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রধান জীবজ উপাদান কোনটি ?
ক. রেস্ট্রিকশন এনজাইম খ. প্লাজমিড গ. এক্সপ্ল্যান্ট ঘ. এফ ফ্যাক্টর

৯. DNA খণ্ডক জোড়া লাগানোর জন্য ব্যবহৃত হয় কোন এনজাইম ?
ক. রেস্ট্রিকশন খ. হেলিকেজ গ. পলিমারেজ ঘ. লাইগেজ

১০. মেরিস্টেম কালচারের উদ্দেশ্য হলো-
ক. বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ সংরক্ষণ
খ. রোগমুক্ত চারা উৎপাদন
গ. হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন
ঘ. উন্নতজাত উদ্ভাবন

১১. কোন প্রযুক্তিতে ইনসুলিন তৈরি করা হয়?
ক. জিন ক্লোনিং খ. ডিএনএ রিকম্বিনেন্ট গ. টিস্যু কালচার ঘ. এক্সপ্লান্ট কালচার

১২. নিচের কোনটি হতে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভব ?
ক. কাণ্ড খ. ভ্রূণ গ. পরাগধানী ঘ. মূল

১৩. সাইব্রিড এর ক্ষেত্রে মিলন হয়-
ক. নিউক্লিয়াসের খ. সাইটোপ্লাজমের গ. রাইবোসোমের ঘ. কোষ প্রাচীরের

১৪. টিস্যু কালচার প্রযুক্তির কালচার মিডিয়ামের প্রধান উপাদান হলো-

CamScanner